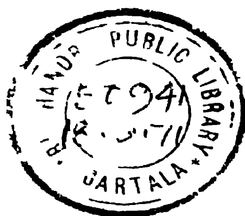
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

সাধকভাব

স্বামী সারদানন্দ





উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

গ্রন্থ-পরিচয়

ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমবা তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনানুরাগ এবং সাধনতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা কবিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধক-জীবনের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যসকল তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনেব সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাঁহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগেব অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্য তাহার ভক্তসকলের মনে তাঁহার জীবনের ঐ কালেব কথাসকল দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার কৃপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যেখানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসবেরও

অধিককালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও সক্ষম হইয়াছি এবং ঐজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৺ষোড়শীপূজা সম্বন্ধে সত্য ঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থখানি লোককল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়


DRA PUBLIC

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

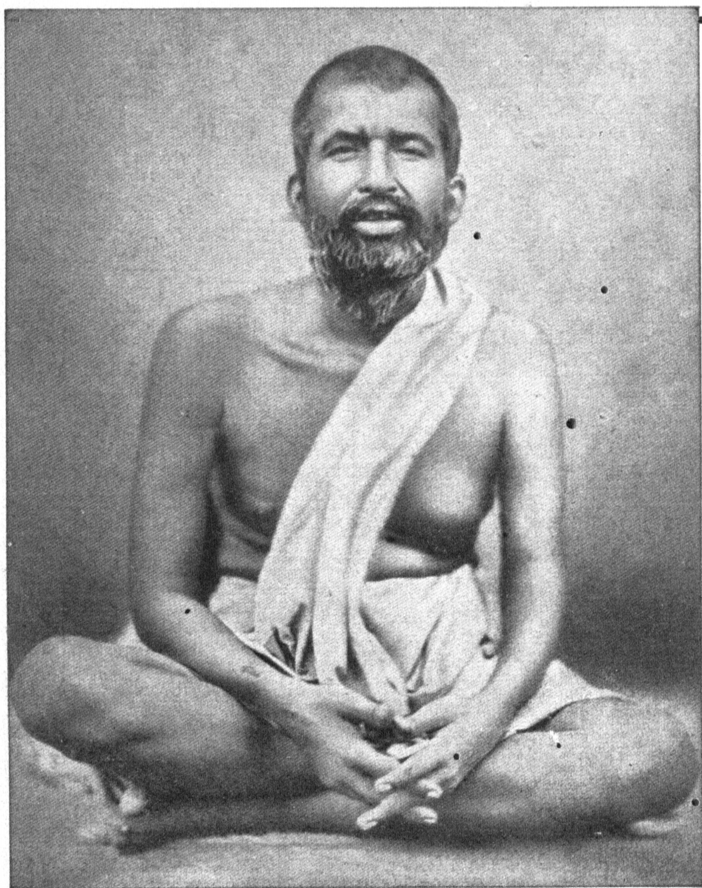
ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

৺ষোড়শীপূজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমনকালের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অবতরণিকা

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতারপুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা-নিরাশা, ভয়-বিস্ময়, আনন্দ-ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন—অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত স্থির দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের, শিক্ষা, উদ্যম ও কার্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্বাপর কার্যকারণসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—

আচার্যদিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা দুটি একটা মাত্রই জানিতে

পারা যায়। আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয় কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্বত্র।

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষ-চরিত্রের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

তাঁহারা কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, এ কথা ভক্ত মানব ভাবিতে চাহে না।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিক স্বরূপে সর্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতারপুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি,

দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভান করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভান বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ ভাবিয়ে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুক্তিযুক্ত নহে

নিজ দুর্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগকালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারংবার বলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতি-নিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন-তাড়নাদি করিতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদিলাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে ঠাকুর সেজন্য তাঁহার ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, "ওগো, ঐরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; ঐশ্বর্য

দেখলে ভয় আসবে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) 'তুমি আমি'-ভাব, এটা আর থাকবে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্নমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত, "আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন," ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন, "আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মা'র ইচ্ছা হইবে," ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমি তো মনে করি রে, তোদের সকলের সব বকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কই?" উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ চালাইতে থাকিত, তাহা হইলে ঠাকুর তাহাতে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন, অথবা বলিতেন, "কি বলব বাবু, মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরূপ নির্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, "কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।"

ঠাকুরের উপদেশ—ঐশ্বর্য-উপলব্ধিতে 'তুমি-আমি'-ভাবে ভালবাসা থাকে না, কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন পাড়া গিয়াছে, তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীর-মনে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোককল্যাণ সাধন করিবেন—ঠাকুর এ কথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল—প্রথম হইতে ঠাকুর ঐ কথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম-জীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজীর নিকট বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, "দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবদ্গীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জন্য দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট যাইলেই ঐ 'অষ্টাবক্র-সংহিতা'খানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ 'অধ্যাত্মরামায়ণের' কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম—ও বই পড়ে কি হবে? আমি

ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির কথা।

ভগবান, একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপকথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান।' কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।"

স্বামীজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া—অন্য নানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালকভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন-উপবেশন, আহার-বিহার, ধর্মচর্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামীজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কিভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান

করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ববৎ সুস্থ হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুব যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ কবিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধাবণা সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামীজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও, কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ স্বামীজীর স্বভাবই ছিল, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তখন তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে—বালক স্বামীজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারিজন স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে

রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয়, এজন্য বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূর পূর্বে অবস্থিত রন্ধনশালার জন্য নির্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাকত।" ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "ব্যস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি?"

অ। ব্যাটারি (electric battery) ধরলে যেমন কি একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।

অপর ব্যক্তি অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপছিল?"

অ। হাঁ, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পারছিলুম না।

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্তা তখন আর হইল না, স্বামীজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই-প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীর ভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল, স্বামীজীকে ইতিপূর্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গম্ভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটার সময় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "ঠাকুর ডাকিতেছেন।" শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে, তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে

হঠাৎ অমনটা আর করিস্ নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।”

স্বামীজী বলিতেন, “আমি তো একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি, ঠাকুর সমস্ত জানতে পেরেছেন। কি করি—তাঁর ঐরূপ ভৎর্সনায় চুপ করে রইলুম।”

ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অভেদানন্দের ঐ ভাব-প্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া, ঠাকুরের শরীরত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

নরলীলায় সমস্ত কায সাধারণ নরের ন্যায় হয়

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষকৃত চেষ্টাসকলকে মিথ্যা ভান বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন, ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, ‘নরলীলায় সমস্ত কার্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়, নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্বলাভ করিতে হয়।’ জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে

এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে জীবের প্রতি কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপু ধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা", "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে, তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল ও গড়ে তোল", "কিছুই যদি না পারবি তো আমার উপর বকলমা দে" ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক করে সব বাসনা ত্যাগ কর, তবে তো হবে," "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক্", "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক্", "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর" ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয়, ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্‌টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে?

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীরত্যাগ হয়।

ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে—গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক—মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। • তাই মানুষ মনে করছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়, সাধনভজন করাতে তো মানুষের হাত নাই? সকলেই তো বলিতে পারে—আমি যাহা কিছু করিতেছি, সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে। কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধনভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাকত, তবে তো সকলেই তা করতে পারত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক দেন না। ঐজন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম করে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ করলে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়।

কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম করতেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন্—

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ

"গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরকভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানারূপে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললে—আচ্ছা ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে, আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বললে, 'বটে? তবে আমার এই নরকভোগ হ'ল—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললেন, 'সে কি? তোমার নরকভোগ হল কই?' নারদ বললে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সৃজন তো স্বর্গ নরক! তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বললে—এই নরক, তখন ঐ স্থানটা সত্যসত্যই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কি না! বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বললেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।"—এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে, তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়।

আমাদিগেরই ন্যায় উত্তম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয় এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয়, ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারেব রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন-সমস্যার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতারপুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং ঐজন্যই আমরা তাঁহার মানবভাবসকল সর্বদা পুরোবর্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে, তাঁহার সাধনকালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বর-লাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতার-পুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না

উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই তো আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন। অতএব যেদিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" কথাটি এরূপ বাস্তবিকই সত্য। তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্যবসিত হইবে এবং জগৎকারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার স্বতঃ ধারণা হইতে থাকিবে।

বদ্ধমানব মানব-ভাব মাত্রই বুঝিতে পারে

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের মায়াতীত দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজাগ্রহণ

করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেবমানব-রূপধারণ। পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত দেবমানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধন-কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে, কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্বেই তাঁহার সাধকজীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর লোকসকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানবদেহধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতার-পুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর

প্রথম অধ্যায়

সাধক ও সাধনা

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়তো একথায় বলিবেন, ভারত তো চিরকাল কোনও-না-কোনও ভাবে ধর্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে, তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতার-পুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেকস্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবল-মাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি, অসম্বদ্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার একপও

দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসে বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণাপূর্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেকস্থলে প্রচারিত হইতেছে। বৈরাগ্যবান না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধনাসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়বিরুদ্ধ হইবে না।

সাধনার চরম ফল সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন

“ঠাকুর বলিতেন, “সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা” —সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন-অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, মানুষ, পশু, গাছপালা, জীব-জানোয়ার, দেব-উপদেব —সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকলপ্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির

সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐসকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠকবে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবাব সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উত্তর। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয়, ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থাব সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতবের ভ্রম ধরিযা থাকি। পূর্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা. ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি এবং কবে হইতেই বা আমাদেব এই ভ্রম আসিযা উপস্থিত হহল?

উ। ভ্রমেব কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ, ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিযা ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবেব উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয না। অজ্ঞানাবস্থায় থাকিযা অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না।

প্র। তবে উপায়?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে দূর করা যায়, তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা, কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্বে আরও দুই-একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই ভুল?

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই সত্য। উহার কারণ

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই যে সর্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি, কারণ ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিতমৃত্যু মানব-জীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান মানবমনে সর্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া, যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

প্র। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি, তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না, এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকেব ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্যের কথা নহে। পাঁচজনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচজনেব ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই তো দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মেব একেবাবে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমাব কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখনও সত্য হয় না।

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণেব মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সকলের একপ্রকারে ভ্রম হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টিমন ঐ বিরাট মনেব অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকাব কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এজন্যই আমবা প্রত্যেক পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞানলাভ কবিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমেব হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে, সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাটমনে জগৎরূপ কল্পনার উদয়

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানব-সাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিবাট মন কিন্তু ঐজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে

হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ, সর্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎকল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি কর্ছে, সাপের তাতে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায়, ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

জগৎরূপ কল্পনা দেশকালের বাহিরে বর্তমান। প্রকৃতি অনাদি

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা এক-ভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন সমষ্টিভূত বিশ্বমনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে ছিল না, পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়- যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের

ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ় ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ দর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র, এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্বদা সক্ষম হই।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নামরূপ, দেশ কাল, মন-বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান, তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্বোক্ত চেষ্টা দুইটি প্রধান পথে এতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম, শাস্ত্র যাহাকে 'নেতি, নেতি' বা জ্ঞানমার্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তিমার্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরমলক্ষ্যের কথা প্রথম হইতেই হৃদয়ে ধারণা ও সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন

'নেতি, নেতি' ও 'ইতি, ইতি' সাধনপথ

অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে, তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা-জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি' মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সেজন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি, নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ 'ইহা নহে, উহা নহে' করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তর্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল, বাহিরের অন্য বস্তুসকল অপেক্ষা তাহার নিজ দেহমনই তাহাকে সর্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, দেহ-মনাবলম্বনে

জগৎকারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। আবার "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না" ; তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট 'আমি কোন্ পদার্থ', এ বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

'নেতি, নেতি' পথের লক্ষ্য—'আমি কোন্ পদার্থ' তদ্বিষয় সন্ধান করা

পূর্বে বলিয়াছি জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানবমন সর্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র 'নির্বিকল্প' সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ', এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।* অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধি অনুভবে কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য।

নির্বিকল্প সমাধি

ভক্তিমার্গকে 'ইতি, ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য সত্য ও বর্তমান বলিয়া

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় দেখ।

বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাকে তিনি দূর-পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপেরঞ্চ প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্বকার্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায়, এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। পূর্বে বলিয়াছি, ভক্ত ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসনয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না, কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, উহাও আবার দর্শনমাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-চক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয়, ততক্ষণ স্থিরভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্তির চলা-ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি

'ইতি, ইতি' পথে নির্বিকল্প সমাধি লাভের বিবরণ

ঞ্চ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ আকাররহিত সর্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সদৃশ পদার্থবিশেষই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

হয়। তখন ঐ মূর্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত চক্ষু মুদ্রিত বা উন্মীলিত করিয়া ধ্যান করুন না কেন, ঐ মূর্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পরে, 'আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিয়াছেন'—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপসকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—"যে ব্যক্তি একটি রূপ ঐ প্রকার জীবন্তভাবে দর্শন করিয়াছে, তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ইতিপূর্বে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্তিসকলের দর্শনলাভ যাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলের ন্যায়, ধ্যান-কালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাঁহার মনে বাহ্য জগৎটাকে মনঃকল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্প সমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাব-রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু

সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয়বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সমাধির নির্বিকল্পভূমিলাভ তাঁহার নিকট অধিক দূরবর্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্বজ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাব মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্বিকল্প করিতে পাবিলে ঈশ্বরসম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবাব ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বর কৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্বক চিরশান্তিব অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পাবে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টেব সহিত তখন একত্বানুভব কবেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চবম লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব, উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে; অথবা ভিতরের

দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায়, উহা তাঁহাদিগের মানবভাবের বহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়,—মীমাংসা যাহাই হউক না কেন ঐরূপ ঘটনা কিন্তু অবতার-পুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্যের কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, একথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতারচরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে।

অবতারপুরুষে দেব ও মানব, উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীত হয়। দেব ও মানব, উভয় ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেবমানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারজীবনে সাধকভাব

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি, ততই তাঁহাতে দেব ও মানব, উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্তমানতা যে সম্ভবপর, একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগেব ধারণা তিনি দেবমানব—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানবভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতার পুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, তাঁহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার

কখন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন।—তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে। আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত, একথা তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণপূর্বক দিব্যভাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে এবং তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ শক্তির অস্তিত্ব জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিতে করিতে উহার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা তাহাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

সকল অবতারপুরুষেই ঐরূপ

তাঁহাদিগের ঐরূপ বাসনায় স্বার্থপরতার নামগন্ধ থাকে না। ঐহিক বা পারলৌকিক কোনপ্রকার ভোগসুখলাভের প্রেরণা তো দূরের কথা, পৃথিবীস্থ অপর অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি—এইরূপ ভাব পর্যন্ত তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ে সম-সমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি কি বাস্তবিকই

অবতারপুরুষে স্বার্থসুখের বাসনা থাকে না

জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনা-বিজৃম্ভিত, তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ-সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

শুধু তাহাই নহে। পূর্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগৎটাকে দুইভাবে দেখিতে পান বলিয়াই দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাত-মনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানবসাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসারের নানা অবস্থাবিপর্যয়ে অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত শক্তিকে সম্যক্‌প্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমি-সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতেপারিবেন এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটি প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় ঐ করুণা তাঁহাদিগের অন্তরে শতধারে বর্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপেই যে উহার উৎপত্তি হয়, একথা বলা

তাঁহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধনভজন

যায় না। উহা সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর—

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দ-কাননদর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গানবাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। শুনে ইচ্ছে হোলো, ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে। চারিদিকে ঘুরে দেখলে, ভিতরে ঢোকবার একটিও দরজা নেই। কি করে?—একজন কোনরকমে একটা মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে লাগলো ও অপর দুইজন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের ওপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাহা করে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লো—কি যে ভিতরে দেখলে তা নীচের দুজনকে বলবার জন্য একটুও অপেক্ষা করতে পারলে না। তারা ভাবলে—বাঃ—বন্ধু তো বেশ, একবার বললেও না কি দেখলে!—যা হোক, দেখতে হোলো। আর একজন ঐ মই বেয়ে উঠতে লাগলো। উপরে উঠে সেও প্রথম লোকটির মত হাহা করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। তৃতীয় লোকটি তখন কি করে—ঐ মই বেয়ে উপরে উঠলো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখতে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও ওতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি ওতে যোগদান করি, তাহলে বাইরের অপর দশজনে তো জানতে পারবে না এখানে এমন আনন্দ-উপভোগের জায়গা আছে, একলা এই আনন্দটা ভোগ করবো? ঐ ভেবে সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেমে এলো ও দুচোখে যাকেই দেখতে পেলে তাকেই হেঁকে বলতে লাগলো—

'ওহে, এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি!' ঐরূপে বহু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও ওতে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতারপুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।

বতারপুরুষদিগকে তাহ ধারণ মানবের পর্যায় সংযম-অভ্যাস করিতে হয়

পূর্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়তো স্থির করিবেন, অবতারপুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না, শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেইজন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি—তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হয়।

মনের অনন্ত বাসনা

মানব-মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনন্ত বাসনান্তরসমূহ উহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে, একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ, তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল; সেটিকে পরাজিত করিলে তো আর একটি আসিল; স্থূলকে পরাজিত করিলে তো সূক্ষ্ম আসিল; তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে তো সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল। কাম যদি

ছাড়িলে তো কাঞ্চন আসিল, স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চনগ্রহণে বিরত হইলে তো সৌন্দর্যানুরাগ, লোকৈষণা, মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল, অথবা মায়িক সম্বন্ধসকল যত্নপূর্বক পরিহার করিলে তো আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল।

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী* ও চিন্তা পর্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-ভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারংবার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার এক দিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে-কেহই যাইতেন, সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা পাইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজ পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী ও তাঁহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায়, ৬০ ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

ঐ বিষয়ে স্ত্রী-ভক্তদিগকে উপদেশ

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

"হয়তো, বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নেই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দু-চারগাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করচে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না—তার তো সময় হয়েছে। তা হবে না!

"হয়তো বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নী হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে হাত নেড়ে গিন্নীপনা কচ্চেন—সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াসুদ্ধ লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্চেন—'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!'—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ছাখ—তা না!"

এক রহস্যের কথা—আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শনলাভ করলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিণী-

ভগ্নীদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন। ঠাকুরকে কেহই সেকথা ইতিপূর্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানবমনে অনন্ত বাসনাস্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটির অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই, আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়?—ঠাকুরঝি কি মনে করবে।" পরিচিতা বলিলেন, "তা কি করবো, ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আর তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি?"

মানবপ্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনাবাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়।

অবতার-পুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম

চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতারপুরুষসকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উঁহাদিগের মূর্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভান কিরূপে বলিব?

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়তো এখনও বলিবেন—"কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ, অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর তাঁহার

অবতারপুরুষের মানবভাবসম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা

গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নবদেহধারণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বরলোকানুগ্রহ করিবেন বলিযা নিজ মাযাশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন, এইরূপ পরিলক্ষিত হন।'* স্বয়ং আচার্যই যখন ঐকথা বলিতেছেন, তখন তোমাদের পূর্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে?" আমরা বলি, আচার্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়াইবার স্থল আছে। আচার্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভান বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমাব, আমাব এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে ভান বলিতেছেন। সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যা ভান বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।† অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয়গুলিকে সত্য বলিব, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতারপুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

* স চ ভগবান্…অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে।

গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা

† শারীরকভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

কথাটির আর একভাবে আলোচনা করিলে পারমার্থিক হইতে সময়ে অদ্বৈতভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করা যাইতে

ঐ কথার অন্যভাবে আলোচনা

সম্বন্ধে দুইপ্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটি কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয়, উহা নাই বা কোনও কালে ছিল না—'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, আর দ্বিতীয় বা দ্বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নামরূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান জীবনে অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈতভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতারপুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি-বিশেষকেও ঐরূপে দুই ভাবভূমি হইতে দুইপ্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ মানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈতভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাবভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া

গীতাভাষ্যের পুস্তলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক, অদৃষ্টপূর্বশক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে!

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎসম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি

অবতারপুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত-সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায়, তাহা তাঁহারা মিথ্যা ভান করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত-সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানব-ভাব পরিশূন্য দেখে

পূর্বে বলিয়াছি, মনে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দৃষ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ়

অস্তিত্বানুভব, অবতার পুরুষসকলের জীবনে শৈশবকাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারংবার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাঁহারা স্থূল, বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান্ হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিতে উঠিযা যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নামরূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাইযা তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতারপুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন, তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা, স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইযা দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর অবতারপুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অবতারপুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের শক্তির প্রভেদ

অদ্বৈতভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইযা অবতারপুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্নভূমিতে অবরোহণ করেন, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ, উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্বদা সর্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের

অবতার—দেবমানব, সর্বজ্ঞ

ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইযা তাঁহারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব আমরা তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ-পূর্বক তাঁহাদিগের অভয় শরণ গ্রহণ করিযা থাকি এবং তাঁহাদিগের অপার করুণায পুনরায একথা হৃদযঙ্গম করি যে—বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎকারণের অনুসন্ধান ও শান্তি লাভ কখনই সফল হইবার নহে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎ কারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বলিবেন—বাহ্যজগতের বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল কতদূর উন্নত হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে, তাহা যে দেখিয়াছে সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারে না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সত্য হইলেও উহার সহায়ে পূর্ণ-সত্যলাভ আমাদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান জগৎকারণকে জড় অথবা আমাদিগের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহার উন্নতি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ বহির্মুখ হইয়া অধিক পরিমাণে রূপরসাদি-ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেছি। অতএব, একমাত্র জড়বস্তু হইতে জগতের সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তর-রাজ্যের বিষয়সকল আমাদিগের নিকট চিরকালই অন্ধকারাবৃত ও অপ্রমাণিত থাকিবে।

ভোগবাসনাত্যাগ ও অন্তর্মুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভপূর্বক শান্তিলাভ সুদূরপরাহতই থাকিবে।

অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া বাল্যকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানা সময় নিজ পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন; বুদ্ধ বাল্যে উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া জম্বুবৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিলেন; ঈশা বন্য পক্ষীদিগকে প্রেমে আকর্ষণপূর্বক বাল্যে নিজহস্তে খাওয়াইয়াছিলেন; শঙ্কর স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তিপ্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরপ্রেমিক হেয়-উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেই ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজমুখে শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয়* করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে-ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের

* চুবড়ি।

আল্‌পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় একঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না। পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরেব এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আমুড় নামে গ্রাম। আমুড়ের বিষলক্ষ্মী* জাগ্রতা দেবী। চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর-দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয় এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ-সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া

৺বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা

---

* উক্ত দেবীর নাম বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী, তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে মনসাদেবীর অন্য নাম বিষহরি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরি শব্দটি বিষলক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসামঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসাদেবীর রূপবর্ণনায়

নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির, রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তরমধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবীব অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদনমাত্র বৎসব বৎসর কবিয়া দেয়। ইষ্টকনির্মিত মন্দির যে এককালে বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিবেব কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিযাছেন। বলে—

গ্রামের রাখালবালকগণ দেবীব প্রিয় সঙ্গী, প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাডিয়া দিযা বসিবে, গল্প-গান কবিবে, খেলা করিবে বনফুল তুলিয়া তাহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রী বা পথিক-প্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ কবিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পাবেন না। এক সময়ে কো...

বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসাদেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ কবিযা থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢেব অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্টপূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যে-সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল, তাহারা দ্বারের জাফরির রন্ধ্রমধ্য দিয়া দর্শনী-প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণবালকদিগের আর পূর্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা, মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোব দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে? সরল কৃষাণবালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে, পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল। তদবধি যে-কেহ পুনরায় মন্দিরনির্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন, ঐ কর্ম তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখালবালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দিরমধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্বনাশ করবো—বংশে কাকেও জীবিত রাখবো না!"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই একজন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন ইঁহাদের সঙ্গে ছি.লন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে ঠাকুর মাতাঠাকুরানীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক-কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর-দেবতার পুণ্যকথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন-বল্ দেখি ? হ্যাঁ রে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয় !" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না ; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে-সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যা-ই বলিস্, তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজহস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পালপার্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রাগান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি—গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে।"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, "আমিও যাব।" বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগের তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তি হইল না। কারণ সর্বদা

প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুরদেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই-চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি তো তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুরদেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং কি অসুখ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের বারংবার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্যন্ত দিল না। পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দিগরমি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন উপায়? দেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়! প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে। এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুরদেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া

কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই তো? সরলপ্রাণ পবিত্র বালক ও স্ত্রীপুরুষের উপরেই তো দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐ কথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও, মা, রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে কূল দাও।'

আশ্চর্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল। তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।*

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বের ঐরূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাঁহাকে লইয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌-চিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদি বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

চন্দ্রাদেবীর মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি ঘটনা বাল্যকাল হইতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরূঢ় হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণবণিক বাস করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল, তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত ইষ্টকবিনির্মিত শিব-মন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। এ পরিবারের দুই-একজন মাত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ঘরদ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, পাইনদের তখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমিজেরাত, চাষবাস, গরুলাঙ্গলও যেমন ছিল, নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসতবাটীটি ইষ্টকনির্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাঠকোঠাতেই* বাস করিতেন, দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন। কর্তার নাম সীতানাথ ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল, এবং বিবাহিতা হইলেও

* বাঁশ, কাঠ, খড় ও মৃত্তিকাসহায়ে নির্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে 'মাঠকোঠা' বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

ব্রাহ্মণী কিছুমা

নাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন ...জীবনে সাধকভাব

বস্তু দর্শনলাভপূর্বক প্রেম

করিতে বহুকালপূজিত ... লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে

রিলেম ! ... ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই

প্রথম দর্শনের প্রীতি ...শিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল

...ত হইতে লাগিল। ...ঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে

...দেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লী-

...দিগে সহসা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের

মধ্যে ... এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে

...ধ্যাত্মিক দর্শন ও অ... ...কারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ

...ত্য নানাবিধ প্রশ্ন ... শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে

...র সমাধান ... ...াহবা, 'বাহবা', 'গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে,'

...গের দেহমনে ... পালাটা এত সুন্দর করতে পারবে তা কিন্তু ভাবিনি',

...দ্বিষয় পাগাগিয়ে নি... আমাদের একটা যাত্রার দল করলে হয়' ইত্যাদি

... পঞ্চব... অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই

থাকে, ...নি দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু

হইতে ঐ ...তেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও

পাইনরা ...নি বা বলাকহা কিছুই কবিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ...

একদিকে ...তুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন, তাহার হস্ত-পদ

করিয়াছি...লক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

রাত্রিভাগ...—জল, চোখে মুখে জল দাও, কেহ বলিল—বাতাস কর,

...—শিবের ভর হয়েছে, নাম কর, আবার কেহ বলিল—

...ভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হল না দেখচি' ...হা

...র কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল

গা... ...ধে লইয়া কয়েকজন কোনরূপে বাড়ী পৌছাইয়া

দিল। শুনিয়াছি সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।*

* কেহ কেহ বলেন, তিনি তিনদিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট-খাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিবদুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন, "এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়? এইভাবে আঁকিতে হয়"—বলিয়া যেভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইয়া মূর্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিবে, তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্তি এমন সুন্দরভাবে গড়িলেন ও আঁকিলেন যে, লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য বলিয়া স্থির করিল।

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহজাল মিটিয়া যাইয়া সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভপূর্বক স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।*

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীনির্দেশ

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে-সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তিপ্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনার ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতারূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্মিত হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম

* 'গুরুভাব'—পূর্বার্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

বা করুণারূপ আকারে তরঙ্গসমূহের উদয় করিতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্র-কাননে একত্র করিয়াছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া এবং আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়াদর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে—একবারমাত্র শুনিয়া পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে?

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত

উপনয়নকালে বালক আত্মীয়স্বজন ও সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল—কর্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতারূপে বরণ করিবে!* অথবা ধনীর স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচজাতীয়া রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল। ধনীর ভীতিপ্রসূত সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত

* 'গুরুভাব'—পূর্বার্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৪০ পৃষ্ঠা।

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা-ফকির দেখিলে শহর বা পল্লীগ্রামের বালকদিগের হৃদয়ে সর্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকিরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বল-প্রয়োগে দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে, এরূপ কিংবদন্তী বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণপ্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে, সেই পথ দিয়া তখন নিত্য ঐরূপ সাধু-ফকির, বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া-আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য সংগ্রহপূর্বক দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিংবদন্তীতে ভীত হইয়া বয়স্তগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ফকিরের দল দেখিলেই সে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের ন্যায় বেশ-ধারণের জন্য বালক একদিন সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন এবং পিতামাতা-প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে ধারণপূর্বক জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল।

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু

রঙ্গরসপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত

এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাদুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদের নিকটে কিরূপে উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কতপ্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও সুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্যকৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয় ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ তো দূরের কথা—সঙ্কীর্ণ স্বল্পমাত্র গন্ধও যে-সকল ভাবে অনুভূত হইবে, কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্বকাল সর্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়-মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথা বিশেষভাবে

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন

স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় সেই বিদ্যা শিখিব

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" তাঁহার বয়স তখন সতের বৎসর হইবে এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাস কালে ঠাকুরের আচরণ

ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠ অগ্রজ টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটি বর্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপন-পূর্বক ছাত্রগণকে পাঠদান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা গমনপূর্বক দেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা স্বল্পকালেই তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সহসা তিনি উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপস্বত্ব হইত, তাহা অল্প এবং দিন দিন হ্রাস

ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না, এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক-স্বরূপে যাহা পাইতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়া তাহার উপর উক্ত দেবসেবার ভার অর্পণপূর্বক তিনি অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গদাধর এখানে আসিয়া অবধি নিজ মনোমত কর্ম পাইয়া উহা সানন্দে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা ও তাঁহার নিকটে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করিতেন। গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান-পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইযা উঠিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ ও দেবভক্তিদর্শনে তাহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাইফরমাশ' কবাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠে ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটি আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইযা উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ-দিগের সহিত মিলিত হইযা আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং, এখানে আসিযাও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বোক্ত বিষয লক্ষ্য করিযাও রামকুমার ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে তো মাতার প্রিয কনিষ্ঠকে তাহার স্নেহসুখে বঞ্চিত কবিয়া একপ্রকার নিজের সুবিধাব জন্যই দূরে আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইযা লোকে তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, এই অবস্থায় যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত?

ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসতুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামান্তরে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই তো চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্বদা আত্মহারা বালককে পরে তো সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে, তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা, উভয়ই রামকুমারকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল।

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য নির্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং, তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল, তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বহু আদরের বালক জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না, একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক তো বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোন দিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি, তবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে আদরযত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছিলেন না।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা

টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য স্বীকার করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে,

সংসারযাত্রানির্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্যই তো শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন, সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসরলাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও নিশ্চয়। সামান্যে সন্তুষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন না। সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' ভাবিয়া পূর্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতেছিলেন। সে যাহা হউক, ঐরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

আর [illegible]
গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে
[illegible] অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য [illegible]

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব ...কালের কিছু পূর্ব হইতে তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছিল এবং একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে তখন মৃত্যুমুখে পতিতা ...খিত আছে, সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর ...লিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকে ...ও (তাঁহার পত্নী) এবার আর বাঁচিবে ...র্ণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী কলিকা... শ্রেণীর লোকের বাস, শান্তিস্বস্ত্যয়না... ...য়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতিলাভ করিতে পা... সংসারের আয়ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তা...ত হইতে হইবে না—বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া রা...কুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন ও অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে কথঞ্চি... ...ঘাট ও মুমূর্ষু-নিবাস; ...র জাহ্নবী- তাঁহাকে ঐ কার্য ...র তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে

নেবা ... উপায়? ... পণ্ডিতদিগের

চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার আন্দাজ তিন-চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যেভাবে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলভুক্ত হইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন, তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

রাণী রাসমণি

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা* এবং

* শুনা যায়, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্বে ইংরাজ সৈনিকদিগের একটি ব্যারাক বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। রাণীর জামাতা মথুরবাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি, তাঁহার অন্নপূর্ণামাতাকে দর্শন ও অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলেরাসনা রাণীর হৃদয়ে শুনা যায়, প্রভৃত ছিলেন ; কিন্তু

কথিত আছে, গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ তত্ত্বাবধান একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমিদারিতে বাস করিতে করের দায়ে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জামাতা করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বহু অর্থ দিয়া সরকার নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর রাণী শিক্ষালাভ করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক পাশে কাশী কূল পর্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে, ইংরাজদের জলযানসমূহের না হইলে যাত্রা প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্যের প্রতিবাদ করি নলাভ এবং পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপ রথীতীরে হইতে ক্রয় করিয়াছি, সেই অধিকার-সূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি। ঐরূপ করিবার নদীমধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্যসকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে, অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব। তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন, তবে আমিও আমার অধিকারস্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণ বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায়, রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্বের ন্যায় বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোনাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু-নিবাস; হালিসহরে জাহ্নবী-তীরে ঘাট ও সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে

চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার ...জ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী'
ঠাকুরকে যেজন্য কলিকা ... এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের
কলিকাতায় আসিয়া ই ...প্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে
তাহা আমরা ই ...লিতেছি, তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ ও সন্তানসন্ততি
ঘটনাবলী জ ... , এবং একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু
হইবে। ... প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ
অগ্রজ ই ... ঐ ঘটনায় পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা
কলিকাতা ... গদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া
যে ঘটনাপর ... হৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি
মনোনিবেশ ক ... সন্ততিগণ এখনও বর্তমান।*

কলিকাত ... গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল
রাণী রাসম ... ক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে খোদিত ছিল— 'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রাণীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।

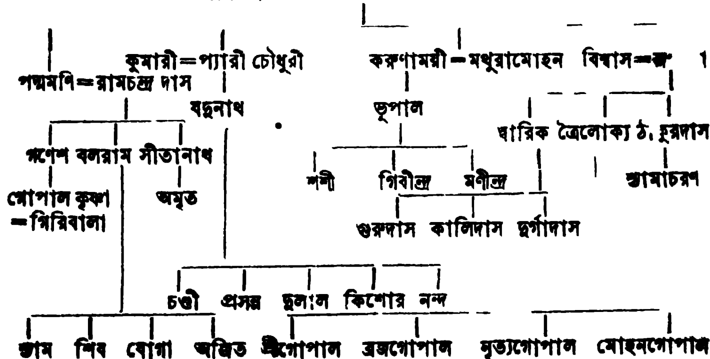
রাণীর দেবীভক্তি

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর জমিদারির প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা এবং দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনার খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগবিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাঠকের অবগতির জন্য রাণী রাসমণির বংশতালিকা 'শ্রীদক্ষিণেশ্বর' নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্যোগকালে প্রত্যাদেশলাভ

৺কাশীধামে গমনপূর্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণামাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা রাণীর হৃদয়ে বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, প্রভূত অর্থ তিনি ঐজন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজ স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠায় রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা



কর, আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব।* ভক্তিপরায়ণা রাণী ঐরূপ আদেশলাভে বিশেষ পরিতৃপ্তা হইলেন এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্যে নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর বহুকালসঞ্চিত ভক্তি এই সময়ে সাকার মূর্তিপরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড† ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন-পরিশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রাণীর দেবীমন্দির-নির্মাণ

এখন হইতে আরব্ধ হইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালয় সম্যক্ নির্মিত হইয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অনিশ্চিত, মন্দির-নির্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প হয়তো নিজ জীবনকালে কার্যে পরিণত হইয়া উঠিবে না। এরূপ আলোচনা করিয়া সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উহার পূর্বের কয়েকটি কথা পাঠকের জানা আবশ্যক।

* কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

† কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর-দানপত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবতাকে সর্বদা আত্মবৎ সেবা করিতে ভালবাসেন—শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নভোগ দিবার জন্য রাণীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন —মন্দিরাদি মনের মত নির্মিত হইয়াছে, সেবা চলিবার জন্য সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা। লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্তঃসারহীন নামযশমাত্র দিয়া আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না। তুমি এখানে নিত্য প্রকাশিতা থাক এবং কৃপা করিয়া দাসীর প্রাণের কামনা পূর্ণ কর।

রাণীর ৺দেবীর অন্নভোগ দিবার বাসনা

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ তো একবারও বলে না যে, অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—হৃদয় তো ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না! তবে এই বিপরীত প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শাস্ত্রকার কি প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষা অনুসরণপূর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না—তবে তো স্থানে তিনি অন্নভোগপ্রদানের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা-গ্রহণে ঐ বাসনা-পূরণের অন্তরায়

ব্যবস্থাসকল আনাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন না।

ঐরূপে মন্দিরনির্মাণ ও মূর্তিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্বোক্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। পণ্ডিতগণের নিকট বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহার আশা যখন ঐ বিষয়ে প্রায় নির্মূলিতা হইয়াছিল, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান

ঐরূপ ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ে আশা আবার মুকুলিতা হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামকুমার ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য করিতে তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপরাপর পণ্ডিতগণ 'কার্যটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ', 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ঐস্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ [illegible]চরণ হইবে, একথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

মন্দিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প

[illegible]ট্টাচার্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে [illegible]য়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া [illegible]কোন কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য

শ্রীঠাকুরে[illegible] নায়ক জনৈ[illegible] [illegible]র দশ বৎসর[illegible]

উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, উহার বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা-প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; ফলে অনেকস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

রামকুমারের উদারতা

সে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই সমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের কার্যভার যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হয়, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া ঐসকল মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধিপূর্বক পূজকের জন্য নানাস্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ

ঠাকুরের ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণের বসতি।

রাণীর কর্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভারগ্রহণ

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম করিতেন। দুপয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্রাহ্মণ কর্মচারী যোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা দূষণীয় নহে, ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য মহেশ উক্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজকপদে মনোনীত করিলেন। ঐরূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে রাণীর কার্যে নিযুক্ত করায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্মচারিসকলের যোগাড় করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক যোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত মহেশ পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন।

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনুরোধ

গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা সুবাদও পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, একথা মহেশের অবিদিত ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও মহেশ কিছু কিছু

---

* কেহ কেহ বলেন, এই বংশীয়েরা কোন সময়ে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জানিতেন। সেজন্য শ্রীশ্রীকালিকামাতার পূজক নির্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার দৃষ্টি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি দুই একজনের বাটীতে পূজক পদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক, ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য সুসম্পন্ন করেন,* তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভমুহূর্তে ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।"

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধপত্র লইয়া মহেশ রামকুমারের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত পূজকের আসনগ্রহণে স্বীকৃত করাইলেন। ঐরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে* আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুরবাবুর অনুনয় বিনয়ে সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়া ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, দেবীভক্ত রামকুমার ঐ বিষয়ে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি-না কে বলিতে পারে।

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন— কামারপুকুরের নিকটবর্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্মচারী ছিলেন। কার্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায় বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্তজাতীয়া, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'একঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, "কেন? এই দেখ, কত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে খাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।" রামকুমার তাহাতে বিদায়গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র* সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয়নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০ মুদ্রায় বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

রাণীর দেবীপ্রতিষ্ঠা

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গা[illegible]

---

* রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।" পূর্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলাল ভট্টাচার্য পূর্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রঞ্জনকল্পতঃ আপন অভীষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য করিবেন, একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই।

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ

অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপূর্বক সন্ধ্যাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—

কালীবাটী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় একশতখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি

গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।* কারণ,* 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন, উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গা ও গাজিসাহেবের পীরের স্থান ছিল, স্থানটির কূর্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্বাহে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভদিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; এমন সময় যে-কোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া

* বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে, যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।' ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত সকল কথাই আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটি আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ৺দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐদিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায়, অশাস্ত্রীয় কার্য করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই, তাহা কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যূষে ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য এবং

প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে-সকল কার্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতুহলপরবশ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ-সাত দিন আব দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্যসমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমাব ফিরিলেন না, তখন মনে নানাপ্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুব পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্ববে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথাব উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বেব এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তিসহকারে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহাব অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানরূপ* স-

* পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত, জানিবার জন্য ধর্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য করিয়া থাকে। ধর্মপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল—"রামকুমার পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ধর্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী তো এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে 'হাঁ' 'না' লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু 'হাঁ' লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কায করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য, বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয়বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন, পিতার চারি সন্তান পূর্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয়বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েকজন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগ করত কোন্ ভ্রাতার ভাগ্যে কোন্ ভাগটি পড়িবে, তাহা ধর্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্বের ন্যায় অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ 'ক' 'খ' ইত্যাদি চিহ্নে নির্দিষ্ট ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটি পাত্রে পূর্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুইজন শিশুকে ডাকিয়া একজনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজখণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাঁহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর, গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা তো মান?" আহার-সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি

বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি। গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে, ততদূর পর্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর-ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে তো, ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, 'একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়।' ঈশ্বরবিমুখ, বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে

বসিয়া বিষয়চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটীশোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরেব গৃহের ন্যায় আপনার কবিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস কবিয়া মনেব পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবেব অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুবের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দুইটি এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডি টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের ঐ কাগজ্ঞলগুলি [illegible]হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে, ত[illegible]ত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের

অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই, তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়া পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা কেন, মানুষ বলিলেই তো হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও, তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভ ', নতুবা তোমাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে না। আমরা বলি—ভ্রাতঃ, আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই; আবার যখন তাঁহার অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের ত্রুটিগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না

মিলাইলে যেমন গড়ন হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ এবং তমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব।" নিজ জীবনের ঐসকল অসম্পূর্ণতার কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তিনি কখন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন—"পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছেন, তবে এবার গুপ্তভাবে আসা—রাজা যেমন ছদ্মবেশে শহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জানা আছে, সকল কথাই আমরা বলিয়া যাইব। হে পাঠক, তুমি উহার যতদূর বিশ্বাস ও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিবে, ততটা মাত্র লইয়া অবশিষ্টের জন্য আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিলেও আমরা দুঃখিত হইব না।

পঞ্চম অধ্যায়

পূজকেব পদগ্রহণ

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কযেক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্প বযস রাণী বাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিযাছিল। দেখিতে পাওযা যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয, তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদযে একটা প্রীতিব আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিযা মথুরবাবুব মনে এখন যে ঐরূপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইযাছিল, একথা পরবর্তী কালে তাঁহাদিগের পবস্পবেব মধ্যে সুদৃঢ প্রেমসম্বন্ধ দেখিয়া আমবা নিশ্চযরূপে বুঝিতে পারি।

প্রথম দর্শন হইতে মথুববাবুর ঠাকুবে প্রতি আচবণ ও সঙ্কল্প

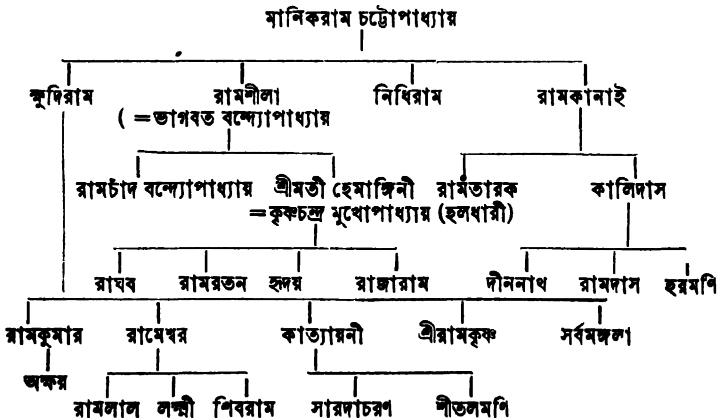
দেবালয প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে একমাস কাল পর্যন্ত ঠাকুর কি ব কর্তব্য, নিশ্চয করিতে না পারিযা অগ্রজেব অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিযাছিলেন। মথুরবাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির কবিযা বামকুমার ভট্টাচার্যের নিকট ঐ বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরুৎসাহিত কবেন। কিন্তু মথুর সহজে

নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী* শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীব পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ঘটনার কযেক মাস পূর্বে কর্মের অনুসন্ধানে বর্ধমান শহরে আসিয়া উপস্থিত হয। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজ গ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধিব কোনরূপ সুবিধা কবিতে পারিতেছিল না। সে এখন লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী বাসমণির নব দেবালযে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে

পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি–



উপস্থিত হইতে পারিলে অভিপ্রায়সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। কালবিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্বক উহা অতিক্রম করিতে হৃদয় পারদর্শী ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্য সত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

সর্বদা অনলস হৃদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল না। ঐজন্য সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, তাহার জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন-কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের ন্যায় আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুকজীবনের গঠনকালে হৃদয়ের ন্যায় একজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী উদ্যমশীল কর্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারংবার

বলিয়াছেন, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে তাঁহার শরীররক্ষা অসম্ভব হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যসংযুক্ত—এবং তজ্জন্যই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিযাছে।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিযাছেন। সহচররূপে তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল, একথা আমবা বেশ অনুমান করিতে পারি। তিনি এখন হইতে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই তাঁহাব সহিত একত্রে অনুষ্ঠান করিযাছিলেন। চিবকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীবামকৃষ্ণদেবের, সাধাবণ নযনে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিযা সর্বদা সর্বান্তঃকবণে অনুমোদন ও সহানুভূতি কবায়, হৃদয় এখন হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইযা উঠিয়াছিল।

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিযাছে—"এই সময় হইতে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচনীয আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তাঁহার রন্ধনাদির সমস্ত যোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময়ে প্রসাদও পাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে

শান্তি পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল। মধ্যাহ্নে ঐরূপ রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি, ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিযাছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা, আমাকে কৈবর্তেব অন্ন খাওয়ালি'।"

ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন, "কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিযা মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গবীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন বাসমণির ঠাকুর-বাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওযাইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায ফেলিয়া দিতে হইযাছে।" তবে ঐরূপে বন্ধন কবিযা তাঁহাকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমবা হৃদয ও ঠাকুর উভযের মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের ধারণা, কালীবাটীতে পূজকেব পদে ঠাকুব যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন, ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ পদে ব্রতী হওয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠাব দুই তিন মাস পবেই হইয়াছিল।

ঠাকুব যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন, একথা হৃদয় বুঝিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা ইহাই,—জ্যেষ্ঠ মাতুল বামকুমারকে যখন সে কোন বিষযে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শযন কবিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে আবাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইতেন। অনেক খুঁজিযাও সে তখন

ঠাকুরেব আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না

তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি যখন ফিরিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এইখানেই ছিলাম।' কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া সে তাঁহাকে পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্তিদর্শনে মথুরের প্রশংসা

হৃদয় বলিত, 'এই সময়ে একদিন মূর্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে তিনি কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটি শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না হইলেও মূর্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়া যায় না, ইহা তিনি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মূর্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে?" হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন —একথা জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্তিটি লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।* ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। তাহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্বে অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহারও চাকরি করিব না—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায় তিনি ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন† একসময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে।" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন, সে তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ-নির্বাহের জন্য চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর

* কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।"

† স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

তিনি সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, "তাতে দোষ নেই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে না ; কিন্তু মার জন্য না হয়ে যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস, তাহলে তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম না। তাই তো বলি, আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নেই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল, "মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু চাকরি না করিলে সংসারপোষণ করিব কিরূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে করবে, করুক না; আমি তো সকলকে চাকরি করতে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বলছি ; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্যভাবে গড়িতেছিলেন এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

চাকুরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ

অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধর্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের

আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিকভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কি-না, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে মথুরবাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যানপূর্বক তাঁহার মনে কষ্ট দিতে হইবে—এই আশঙ্কাই যে ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, তিনি তখন একজন নগণ্য যুবকমাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণহস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি, এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটিও লুক্কায়িত ছিল না। কোনরূপ গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে এখন আর পূর্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা অতঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই একদিন হইয়া দাঁড়াইল। মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ

দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"যাইলেই আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, "তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্যে নিযুক্ত হওযা তো ভাল বই মন্দ নয, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?"

ঠাকুর—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইযা থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকাব কবিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দাযী থাকিতে হইবে, সে বড হাঙ্গামার কথা, আমাব দ্বাবা উহা সম্ভব হইবে না। তবে যদি তুমি ঐ কার্যেব ভাব লইযা এখানে থাক, তাহা হইলে আমাব পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয এখানে চাকরিব অন্বেষণেই আসিযাছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐকথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুববাবুব নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার দ্বারা দেবালযে কর্ম স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইযা পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহাব কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীব পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত কবিলেন। মথুরবাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাবলী হইয়া গেল। ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমী-কৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে

পূজকের পদগ্রহণ

৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় সহসা পড়িয়া গেলেন; বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।* ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াই মথুরবাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ভগ্নবিগ্রহসম্বন্ধে মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ভাব ভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন বিগ্রহমূর্তি-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুরবাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল, একথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না।

০
৺গোবিন্দজীর বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্মচ্যুত হইলেন এবং

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ'—ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৺রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল। হৃদয়ও এখন হইতে পূজাকালে শ্রীশ্রীকালীমাতার বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

ভগ্নবিগ্রহের পূজাসম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণবাবুকে যাহা বলেন

বিগ্রহভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরাহনগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটি ঠাকুর-বাটী আছে। উহাতে ৺দশমহাবিদ্যামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হীনদশাপন্ন হইয়াছিল। মথুরবাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেছেন, তখন তিনি এক সময়ে তাঁহার সহিত উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মণ চাউল ও দুইটি করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে ৺দশমহাবিদ্যা দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন ঐরূপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকুর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্বপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলেন। জয়নারায়ণবাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরাহ্বানপূর্বক সঙ্গীসকলকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি

কথনও ভাঙ্গা হন? জয়নারায়ণবাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পালটাইয়া দেন এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণবাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ প্রশ্নসকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল, যে দেখিত সে মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান!—সে গান যে একবার শুনিত, সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদী কালোয়াতী ঢং-ঢাং কিছুই ছিল না, ছিল কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্ম-প্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে—একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল:

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা,
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান

গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন, একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন

হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজদেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন, সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজা-পদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক পূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি

কথার উচ্চারণ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজপুঞ্জিত শরীর ও তন্ময়ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন।

ঠাকুরকে কার্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব। সংসারে যাহাতে উন্নতি হইবে এরূপ কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটী-মূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রামকুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ বিষয় সদা সর্বদা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে

কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে ?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু'পয়সা উপার্জন করিয়া সংসারনির্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া একান্ত কর্তব্য। সুতবাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবাব অভিপ্রায়ে রামকুমাবকে জিজ্ঞাসা কবেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে যখন বালক মথুরবাবুব অনুরোধে প্রথমে বেশকাবী ও পবে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল, তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীব পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য, তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন, এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে শুনিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবাব সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেনাবাম ভট্টাচার্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার গতায়াত ছিল এবং মথুববাবু-প্রমুখ সকলের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়েব মুখে শুনিয়াছি, যাঁহাবা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহাকে তাঁহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ বামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত ইনি পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম

কেনাবাম ভট্টাচার্যেব নিকট ঠাকুরের শাক্তীদীক্ষাগ্রহণ

তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে স্বল্পায়াসসাধ্য ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকার্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া এবং ঠাকুর এখন ৺দেবীপূজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজকরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় কালীঘরের গুরুতর কার্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না—একথা বুঝিয়াই মথুরবাবু ঐরূপে পূজকের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। রামকুমারও ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠকে ৺দেবীর পূজা ও সেবাকার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষাদান পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি মথুরবাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য কার্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামকুমার ভট্টাচার্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীরত্যাগ হইয়াছিল।

রামকুমারের মৃত্যু

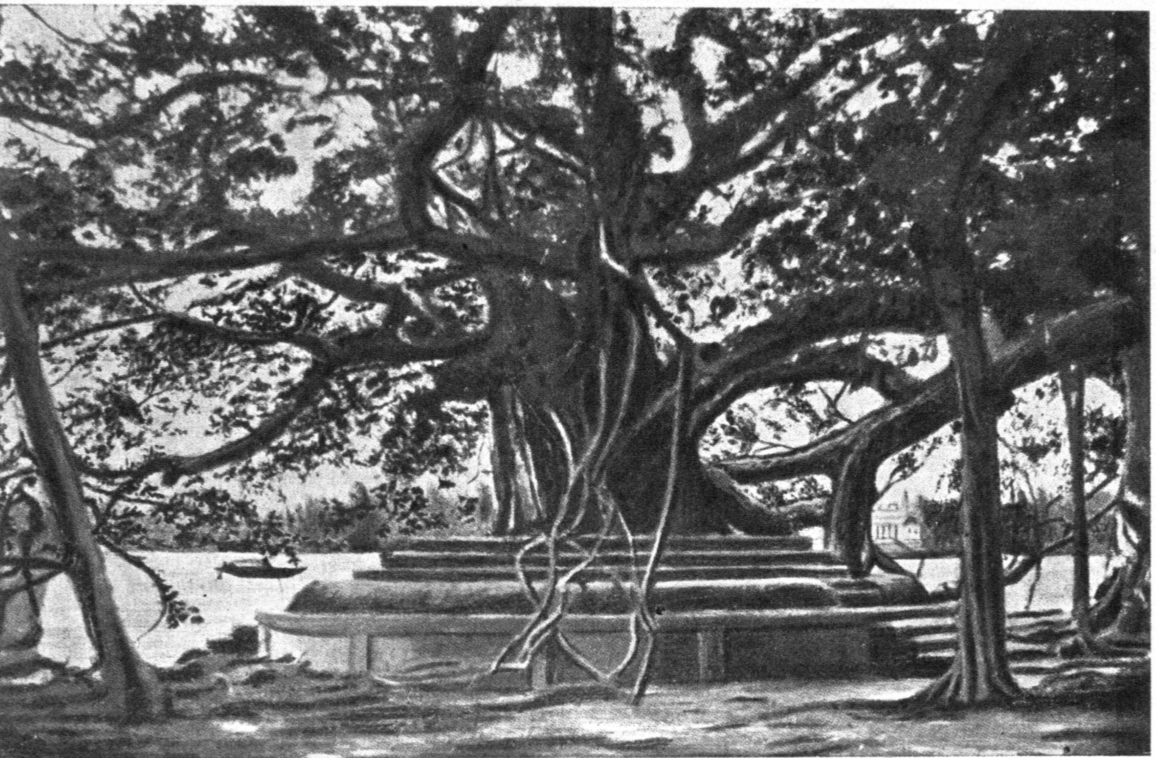
ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং বাল্যকাল হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহেই পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার একত্রিশ বৎসর বড় ছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরের এই কালের আচরণ

পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কে বলিবে, ঐ ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল কতদূর প্রবুদ্ধ করিয়াছিল? দেখা যায়, এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশপূর্বক মানব তাঁহার দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া এই সময়ে তিনি তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-প্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিয়া তিনি এখন তিলমাত্র সময় অপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার ধ্যানে কালযাপন করিতেন।



পঞ্চবটি

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হইত না। কিন্তু সে কি করিবে? বাল্যকাল হইতে তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন, তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই—একথা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিন দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগপূর্বক তিনি পঞ্চবটীতে চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাঁহার পূর্ববৎ আহার ছিল না, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল, ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প

পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো গাছগাছড়ার মধ্যে একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সেজন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর রাত্রে? ভূতের ভয়ে কেহ ঐ দিক মাড়াইত না। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যানধারণা করিতেন।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী-প্রদেশের অবস্থা

রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় একদিন

অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশে ঢিল ছুঁড়িতে থাকিল। তিনি তাহাতেও ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতব রাত্রে যাইয়া কি কব বল দেখি?" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি, শাস্ত্রে বলে, আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে, তাহাব তাহাই সিদ্ধ হয়।

হৃদয়ের প্রশ্ন—রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর?

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা কবিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম বুঝিযাও তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আব স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূব হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল নাকি? এরূপ তো পাগলেই করে, ধ্যান করিবে, কর, কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?' ঐরূপ ভাবিয়া সে সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি হচ্ছে? পৈতে কাপড ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের

ঠাকুরকে হৃদযের ভয় দেখাইবাব চেষ্টা

চৈতন্য হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বলিলেন, "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়, জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐসব খুলে রেখেছি, ধ্যান করা শেষ হলে ফিরিবার সময় আবার পরব।" হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্বে আর কখন শুনে নাই, সুতরাং অবাক হইয়া রহিল এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে সে ভাবিয়াছিল মাতুলকে অনেক কথা অদ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই করা হইল না।

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা—'পাশমুক্ত' হইয়া ধ্যান করিতে হয়

পূর্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু স্থূলভাবেও ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও তাঁহাকে ঐরূপ করিতে আমরা দেখিতে পাই। যথা—

শরীর এবং মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমাননাশের, 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার ও সর্বজীবে শিবজ্ঞানলাভের জন্য অনুষ্ঠান

অভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি,

অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহু প্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকট বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে উপলখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব মন শারীরিক ভোগসুখেচ্ছা হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারংবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং

তদ্বিপরীত নবীন সংস্কার সকলকে উহা এমন দৃঢভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর অন্য ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য করিতে পারিত না। ঐরূপে কোন নবীন ভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম

পূর্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন—"অপবিত্র কদর্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা মাটি মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।"* উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগকরারূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয়জন লোক এ পর্যন্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া যোল-

ঐ ভ্রম সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধনপথ' বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা

* ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত—'Personal Reminiscences of Ramakrishna Paramahamsa' Vide 'Modern Review' for November, 1910.

আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ তো দূরের কথা! কিন্তু রূপরসাদিভোগলোলুপ মানব ঐ কথা বোঝে না। কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্বসংস্কারবশে নিজ শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য করুক না কেন, মনে তো আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি।' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। কামকাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই।* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেছেন, 'যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।' ঋষিগণ সেজন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

আমরা বলিয়াছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায়

* Ye cannot serve God and Mammon together.—Holy Bible

অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজাসমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন, জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।" ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পূজাদি করিতেন

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়তো দুই ঘণ্টা কাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন; অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়তো বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন

করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্ণে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনের সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না।—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়।

ঠাকুরের এইকালে পূজাদি কার্য সম্বন্ধে মথুর-প্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত

সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে, তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয়, ততই সাধারণের মনে পূর্বোক্ত ভাব পরিবর্তিত হইয়া উহার স্থলে শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঐরূপ হইয়াছিল। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুরবাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোনদিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিল।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয়

তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাকছি ; তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?" তিনি বলিতেন—

"মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ; জল [illegible] করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ : ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা

জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!"

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল— কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন' জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-ঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি?—ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি; প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত

না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত! ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথাব বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, "চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না। ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পডিতাম এবং ঐরূপ হইবার পবেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি।—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকাবে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

সপ্তম অধ্যায়

সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শন লাভের আনন্দে ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। পূজাদি মন্দিরের কার্যসকল নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত ইতিপূর্বে কোনও সূত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল।

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া না পড়িতেন, সেদিন পূর্বের ন্যায় পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। "মার নাট-মন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি

বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে ঊর্ধ্বে খটখট করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে—কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবন্ধ করিয়া দিতেছে। যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্তন কবিয়া লইব অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিব বা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইব, তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ববৎ খটখট শব্দ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্যন্ত— ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত, ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম, কখনও বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখনও বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-তরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না; সুতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, যাহা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে কে আর আমাকে শিখাবে, মা; তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় আর কেহই যে নাই!' একমনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম!"

ঠাকুরের পূজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্যে অপরকে বুঝান কঠিন। প্রবীণের গাম্ভীর্য, পুরুষকার-অবলম্বনে দেশকালপাত্রভেদে বিধিনিষেধ মানিয়া চলা অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হইবে, তাহা তুই-ই বলা ও করা'—সর্বান্তঃকরণে ঐরূপ ভাব আশ্রয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য এখন করিতেছেন। উহাতে মানবসাধারণের বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া, নানা লোকে নানা কথা প্রথম অস্ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুদ্র সংসারের বৃথা কোলাহল তাঁহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না। বহির্জগৎ এখন তাহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে আর পূর্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টায় ও ভাবে কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয়

পূজা ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিতেন

মার হাতখানি, বা কমলোজ্জ্বল পাখানি, বা 'সৌম্যাৎসৌম্য' হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখখানি—এখন পূজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস না' বলিয়া তাহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

ঠাকুরের ইতিপূর্বের পূজা দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ

পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লকলক করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!" এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবা মাত্র এবং কখন কখন দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্বে ধ্যানপূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, যাঁহার চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই চিদ্ঘন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সবদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া

শুনিয়াছি, মা পাঁইজর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝমঝম শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িতকেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।"

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা

হৃদয় বলিত, "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা 'ছমছম' করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিয়া কিন্তু মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্যসত্যই পাগল হইলেন? নতুবা পূজাকালে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? রাণীমাতা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিত এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। মনে কিন্তু হইত, মামা ঐরূপে কোন্‌দিন একটা কাণ্ড না বাধাইয়া বসেন!

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যেসকল চেষ্টা

দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত, তৎসম্বন্ধে সে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল—

"দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

"দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন— 'খা, মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়ত বলিলেন, "আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি!'—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা!'

"একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মা মা 'খাবি মা খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক একদিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া—'মা মা আমাকে কাছে শুতে বল্‌চিস্—আচ্ছা, শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না।

"প্রত্যুষে উঠিয়া মা-কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর আবদার, রঙ্গ পরিহাসাদি করিতেছেন।

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই। যখনি জাগিয়াছি, তখনই দেখিযাছি তিনি ঐরূপে ভাবেব ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান কবিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইযা ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালীবাটীর খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুরবাবুর নিকট সংবাদপ্রেরণ

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিযা কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ লইবার তাহাব উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুরবাটীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে এবং তাহারা শুনিয়া ঐকথা বাবুদের কানে তুলিয়া তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন যখন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সহসা

তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না। দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—হয় ভট্টাচার্য পাগল হইয়াছেন, না হয়ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা, ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না; তিনি সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদপ্রেরণ কর্তব্য।

মথুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন। যদবধি তাহা না করিতেছেন, তদবধি ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে পূজাদি করিতেছেন, সেই ভাবেই করুন, তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুরবাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল এবং 'এইবারেই ভট্টাচার্য পদচ্যুত হইল, বাবু আসিয়াই তাঁহাকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল,' ইত্যাদি নানা জল্পনা তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুরবাবুর আগমন ও তদ্বিষয়ে ধারণা

মথুরবাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে, যাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন ঐ বিষয়টি আসিয়াই বুঝিতে পরিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার, অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমভক্তিপ্রসূত,

তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐরূপ অকপট ভক্তিবিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তো কিসে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্যের কখন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব পূজককে দূর হইতে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্যসত্যই এখানে আবির্ভূতা হইলেন, এতদিনে মার পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হইল।" কর্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সেদিন বাটীতে ফিরিলেন। পরদিন মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।'*

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাত্মিকা ভক্তিলাভ—ঐ ভক্তির ফল

পূর্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করিয়া ঠাকুরের মন এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছিল। এমন সরল স্বাভাবিকভাবে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক, তিনি নিজেও ঐ কথা তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসায়

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে! ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি তো?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা, আমার এইরূপ অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে যাহা করিবার করাইয়া ও যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐকথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাহাকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধকজীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐসকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন। গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥—গীতা, ৯।২২

—যে-সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা করিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া থাকে—শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে—প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করিয়া থাকি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্যলাভ করিয়া-

ছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব। কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃ-প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগে যুগে সাধকেরা 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে'—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না—একথা মানবকে উপদেশ দিয়া আসিলেও দুর্বল হৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণরূপে অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়। হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও।

ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব কেবল অবতারপুরুষদিগের শরীর-মন ধারণ করিতে সমর্থ

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়া যায় না। মানব সাধারণের জড় দেহ উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া এককালে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীর সকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই

তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীরধারণ করিয়াও তাঁহাদিগের উহাদিগের প্রব-। বেগে অনেক সময় মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে। ভাব-ভক্তির প্রাবল্যে ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্মের ন্যায় শরীরে প্রতি রোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ কথাতে উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐসকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর ভক্তিপ্রসূত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগধারণে উহা ক্রমে যত অভ্যস্ত হয়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর উহাতে পূর্বের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট—যথা গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে, তৃতীয়, মধুরভাব-সাধনকালে

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইযাছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। উহার বৃদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইযাছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকট অনেক সময় উহার কারণ এইরূপে নির্দেশ করিযাছেন—'সন্ধ্যা পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইযা গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম, তখন কে জানিত, শরীরে সত্যসত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়। সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ

হইল! ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি, সহসা দেখছি কি মিস্‌কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি—আব একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে (শবীরেব) ভিতর হইতে বাহিব হইয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকাব পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল এবং ঐদিন হইতে গাত্রদাহ কমিয়া গেল। ঐ ঘটনাব পূর্বে ছয় মাস কাল গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইয়াছিলাম।”

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পবেই উহা আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে উহা এত বাডিয়া উঠিয়াছিল যে, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিন-চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণদর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনা-প্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীডিত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, “বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন।

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া উহা তাঁহাকে বহুকাল পর্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসতনিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কবচধারণের পরে তিনি ঐরূপ দাহে আর কখনও কষ্ট পান নাই।"

পূজা করিতে করিতে বিষয়-কর্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ডপ্রদান

ঠাকুরের ঐরূপ অদ্ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণীমাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। ভট্টাচার্যের মুখনিঃসৃত ভক্তিমাখা সঙ্গীত-শ্রবণে তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্বেই স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।* অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে ঠাকুরের ন্যায় পবিত্রহৃদয়ের পক্ষে সম্ভবপর, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে রাণী ও মথুরবাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐস্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া 'এখানেও ঐ চিন্তা!' বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন।

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম অধ্যায়

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি।*

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্দোল্লাস উহার অল্পদিন পরে এত বর্ধিত হইয়া উঠিল যে, দেবীসেবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ কোনরূপে নির্বাহ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিক ভাবে হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, "যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্যন্ত গর্ভ না হয়, ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়, গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ভ হয়; পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্ন-প্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে।" শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি-ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। পূজা ও সেবার কালাকালবিচার তাঁহার এখন লোপ হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত, তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়তো ভোগ নিবেদন করিয়া

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্যপূজা-ত্যাগ। এইকালে তাঁহার অবস্থা

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম অধ্যায়

দিলেন! অথবা ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথক অস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্প-চন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে ঠাকুরের এই কালের কার্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন তো এমন ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতেন! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছটফট করিত। আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখন কখন তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া ঐ ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব পর্যন্ত মথুরবাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন; এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। হৃদয় বলিত, "মথুরবাবুর ঐরূপ সঙ্কল্পের একটি কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। পূজাসন হইতে সহসা উত্থিত হইয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও আমাকে মন্দিরমধ্যে দেখিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া

পূজাত্যাগ সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ

বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে, মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, তবে বর্তমান অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব, একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুরবাবুর মন ঠাকুরের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির যত পরিচয় পাইতেছিলেন, ততই মুগ্ধ হইয়া তিনি আবশ্যকমত তাঁহার সেবা এবং অপরের অযথা অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন,—ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাত জানিয়া মথুর নিত্য মিছরির শরবত-পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; রাগানুগাভক্তি-প্রভাবে ঠাকুর অদৃষ্টপূর্ব প্রণালীতে পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; ঐরূপ আরও কয়েকটি কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যেদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে মথুর সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঐ ঘটনায় তিনি তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রাখিয়া যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে শ্বেত জবা প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে তিনি এখন পরাজয় স্বীকারপূর্বক সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশীভূত হইয়াছিলেন, সে-সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুরবাবু এখন অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্মান্বেষণে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকেই তিনি ঠাকুরের আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিলেন। সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি গ্রন্থসকল তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। ৺বিষ্ণুপূজায় তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি

হলধারীর আগমন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মথুরবাবু তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় তো ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুববাবু তাঁহাব ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাকে ভোজন করিতেন।

শাক্তদ্বেষী না হইলেও হলধারী ৺দেবীকে পশুবলিপ্রদানে প্রবৃত্তি হইত না। পূর্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলিপ্রদান করার বিধি ঠাকুর-বাটীতে প্রচলিত থাকায় ঐসকল দিবসে তিনি আনন্দে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, প্রায় একমাস ঐরূপে ক্ষুণ্নমনে পূজা করিবার পরে হলধারী এক দিবস সন্ধ্যা কবিতে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন ৺দেবী ভয়ঙ্কবী মূর্তি পরিগ্রহ কবিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না, কবিলে সেবাপরাধে তোব সন্তানের মৃত্যু হইবে।" শুনা যায়, মাথাব খেয়াল মনে করিয়া তিনি ঐ আদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পবে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন সত্য সত্যই উপস্থিত হইল, তখন ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া তিনি ৺দেবীপূজায় বিরত হইয়াছিলেন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের ঘটনাবলীর যথাযথ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানামতের সাধনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দিরসংক্রান্ত দেবোত্তর-দানপত্র-দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ ঘটনাব কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ ব র ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐসকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

সাধনকালের সময়নিরূপণ

পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬২ হইতে

১২৬৫, চারি বৎসর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত, চাবি বৎসর—যে সময়ের শেষ দুই বৎসরাধিক কাল ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ কবিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানা প্রধানতন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুব নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন। বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচার্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সমাধির নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট হইতে ইসলামী ধর্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতবেই তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধনমার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মেব সকল সম্প্রদায়ের মতের সহিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐসকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য আগমনে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্বোক্তরূপে তিন ভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনকালের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঐ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ

করিয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাই ঐ কালে তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হইয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীর-মনে অশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনয়নপূর্বক উহাই তাঁহাকে বৈধী ভক্তির নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া যোগবিভূতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি

পাঠক হয়তো বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি? ঐ কালেই তো ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন?' উত্তরে বলিতে হয়—একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্তী কালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অন্য প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—"বৃক্ষ ও লতা-সকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটি কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখ দেয়।" সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্বোক্ত কথাটা আমরা একভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যক্ষ ও জগদম্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও ঐসকলকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐসকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে

ঐ কালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন-লাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। গুরূপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে শান্তিলাভ

তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতাসহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভবসকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

পূর্বোক্ত কথার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দেশ করিতে পারি।

ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা

মায়ারহিত শুকের জীবনে জন্মাবধি নানাপ্রকার দিব্য দর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার ঐরূপ হয়, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না। মহামতি ব্যাসের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শুক একদিন পিতাকে বলিলেন, "শাস্ত্রে যে-সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমি আজন্ম অনুভব করিতেছি; তথাপি আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কি-না, তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা আমাকে বলুন।" ব্যাস ভাবিলেন শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য সম্বন্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সে

সংসারত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্নেহের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমি তাহাকে সকল কথা বলি নাই। সুতরাং অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য। ঐরূপ চিন্তাপূর্বক ব্যাস বলিলেন, "আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও।" শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া, গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের ঐক্য দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ স্বার্থে নহে—পরার্থে

পূর্বোক্ত কারণ ভিন্ন ঠাকুরের পরবর্তী কালে সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐসকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইবেন, কেবলমাত্র ইহাই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সেইজন্যই পরস্পরবিবদমান ধর্মমতসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সত্যাসত্য-নির্ধারণের অদ্ভুত [illegible] তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের আচার্যপদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকলপ্রকার ধর্মমতের সাধনার ও তাহাদিগের চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে তাঁহার ন্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের দ্বারা বর্তমান যুগে বেদ, বাইবেল,

পুরাণ, কোরানাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইজন্যও স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্বক যাবতীয় ধর্মমতের সাধনানুষ্ঠানের শাস্ত্রসকল শ্রবণ করিবার অধিকার যে জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল

পূর্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এমন কোন লোক ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই, যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে সুচালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহ-রূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক

দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল ; এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, "শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া যাইত, তাহার হুঁশই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না ; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে, তাই অত কাঁদিতেছে।' " আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "লোকে স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ

হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ বলে, 'তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!' ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুন দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন!" কথাগুলি আমাদের মর্মে মর্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ জীবনে ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা বলিতে পারিতেছেন।

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্যভক্তিসাধনা

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জগদম্বার দর্শনমাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। হনুমানের ন্যায় অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ঐ সময়ে আহারবিহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনি হইয়া পড়িত! পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল

এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"* শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্যভক্তি-সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতিপূর্বের দর্শনপ্রত্যক্ষাদি হইতে এক নূতন ধরনের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসে আছি- ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীমূর্তি-সকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'—এমন

দাস্যভক্তি-সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শনলাভবিবরণ

* **Enlargement of the Coccyx**

সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটীরোপণ

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটি পঞ্চবটী* স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্তী হাঁস-পুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তখন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্বে যে আমলকী

* অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী-অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরী।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥

ইতি—স্কন্দপুরাণ

বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অনন্তর এখন যেখানে সাধনকুটির আছে, তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু-ছাগলের হস্ত হইতে ঐসকল চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে তিনি 'ভর্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্নে এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ-দর্শনপ্রয়াসী পথিক-সাধুকুল ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার কালে কয়েক দিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর-বাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।† ঠাকুর বলিতেন

ঠাকুরের হঠযোগ-অভ্যাস

ঐরূপে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। হলধারী-সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হঠযোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস-পূর্বক উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐসকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের জানা আছে, ঐ বিষয়ে উপদেশলাভের জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছেন—"ও-সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ; এখন হঠযোগ অভ্যাসপূর্বক শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগসহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিতে হয় এবং আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কঠোর নিয়মসকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময় সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। মননিরোধের জন্যই তো প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ুনিরোধ করা। ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই স্বতোনিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টামাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে এককালে দেখা দিবেনই দিবেন।"

হলধারীর অভিশাপ

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ভারতের বর্তমানকালে স্মৃত্যনুসারী সাধক-ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া-প্রেমসাধনরূপ পথে

ধাবিত হন।* বৈষ্ণবমতে প্রীতিসম্পন্ন হলধারীও ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে গোপনে পূর্বোক্ত সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোকে ঐ কথা জানিতে পারিয়া কানাকানি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাঁহার সম্মুখে ঐ কথা আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সহসা কেহ সাহসী হইত না। অগ্রজের সম্বন্ধে ঐকথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন এবং ভিতরে ভিতরে জল্পনা করিয়া লোকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারের বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে!" ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি ৮।৯টা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়সড় করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, "সিমপাতার রসের মত তার মিস্‌কাল রং— ত গাঢ় যে, কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, প্রথম অধ্যায়

সেবার কাজ সারিতেছিল ; ঐ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখ দেখি !' আমার কাতরতা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

"ঠাকুরবাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও ঐরূপ হইতেছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল, ইহাতে বড়ই ভাল হইল ; কারণ, জড়সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য আছে ; তাই তিনি তোমাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন !' সাধুর ঐ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।" ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায় সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের কথা

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজাকার্যে ব্রতী হন এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক-

কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কবিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইযাছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পাবেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পবিধানে কাপড, পৈতা, প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইযাছেন। হৃদয বলিত—"তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, 'হৃদু, উনি কাপড ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড দোষেব কথা, কত জন্মেব পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘবে জন্ম হয়, উনি কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিযা ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান। এমন কি উচ্চাবস্থা হইযাছে, যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা একটু শুনেন, তোমাব উচিত যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষযে লক্ষ্য রাখা, এমন কি বাঁধিযা রাখিযাও উঁহাকে যদি তুমি ঐরূপ কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও কবা উচিত।'"

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরেব নয়নে প্রেমধারা ভগবৎ-নামগুণশ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চযই কনিষ্ঠের ঐ সকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা সাধাবণ মানুষের কখন তো ঐরূপ হইতে দেখা যায় না। ভাবিয়া হলধারী আবার কখন কখন হৃদয়কে বলিতেন, "হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতরে কোনরূপ আশ্চর্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত কবিয়া উঁহার এত সেবা কবিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্বদা সন্দেহে দোলাযমান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে

রিত না। ঠাকুর বলিতেন, "আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়।' সে বলিত, 'এবাব আর তোর ফাঁকি দিবার জো নেই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিযা বলিতাম, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' অনন্তব মন্দিরেব দেবসেবা সম্পূর্ণ কবিযা এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বা অধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিযা একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পডছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হ্যাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি।' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া), 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত, 'যা যা মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্, তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম, 'এই যে বলেছিলে আব গোল হবে না',—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয়, অনেকদিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায়

নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার কবিতে বসিয়াই হলধাবীর উচ্চ ধারণাব লোপ

মূত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থিরনিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন?" ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে, তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী!" ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলিপ্রদান করিলেন। উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান

পূজা করিলে যে?" হলধারী বলিলেন, "কি জানি, হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকাব ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না!"

ঐরূপে হলধারী ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচ, সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান যে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোর ছেলেমেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয়, তাহা দেখিব!" জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস্, জগৎ মিথ্যা ও সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তুই বুঝি ভাবিস, আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বলবো, অথচ ছেলে-মেয়ের বাপ হব! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভৎর্সনা ও ঠাকুরের উত্তর

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামতগ্রহণ করিতে ছুটিতেন।

আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে-সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম —'মা, নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?'—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি সহসা মেঝে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তারপর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঐ মূর্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; সেবার পূজা করিতে করিতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক্!"

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশলাভ—'ভাবমুখে থাক'

আবার পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয়মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, তখনও ঐ কালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন— 'তুই ভাবমুখে থাক্।'

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধুর, ব্রাহ্মণীর, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধুর, ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে কখন কখন অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অতএব হলধারী-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পূর্বোক্ত সাত বৎসরের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্য আমরা ঐসকল পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তিনি ঐকালে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাময়ী ঐরূপ ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণপূর্বক সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের ন্যায় যোগদানে সক্ষম হইতেছিলেন না

বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং ভিতরে অন্যপ্রকার ভাব রাখিয়া সংসারে সকলের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ বা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে, অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন, অতুল সম্পত্তি বারংবার পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

এই কালের ঘটনাবলীর অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কাম-কাঞ্চনোন্মত্ত বদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে কল্পনাযুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্ধারণ করিতে পারে, এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধি-জনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে

ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাটীর মূর্খ লুব্ধ কর্মচারিগণ ঠাকুরের এইকালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে সমাগত সিদ্ধ ও সাধকগণ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঐ বিষযে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিযাছে তাহাতে জানা যায়, তাঁহারা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির কবা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ না এককালে দেহবোধবহিত হইয়া পডিতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত, তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন।

এই কালের কার্যকলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না

পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন, কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন, বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না।—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পাবে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দিব্যোন্মাদ-অবস্থালাভের কাল হইতে ঠাকুর বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারসকল হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান হইলেও বহু লোক একত্র হইয়া সেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্তনাদি করিতেছে, সেখানে যাইতে এবং তাহাদিগের

সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৺দশমহাবিদ্যাদর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐসকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাঁহার কখন কখন দর্শন-সম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আমরা অল্প অল্প যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐসকল সাধকও তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

১২৬৫ সালে পানিহাটি মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে (ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) পানিহাটি মহোৎসবদর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। ৺উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন প্রথম দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঐ দিবস পানিহাটিতে গমন করিয়া তিনি শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিড়া, মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার কালে তিনি পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে

প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।*

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন—'টাকা মাটি, মাটি টাকা', অশুচি স্থান পবিষ্কার, চন্দন-বিষ্ঠায় সমজ্ঞান

এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর কবিবার জন্য কযেক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচাবে নিযুক্ত হইযাছিলেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি জীবনেব উদ্দেশ্য করিযাছে, সে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতেও ঐ বিষযে কোন সহাযতা লাভ করে না। সুতরাং তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন উভযের সমান মূল্য। ঐ কথা দৃঢ ধারণাব জন্য তিনি বারংবার 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবাব বাসনার সহিত হস্তস্থিত মৃত্তিকা ও মুদ্রাসকল গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিয়াছিলেন। ঐরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশরূপে ধারণার জন্য কাঙ্গালীদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্বক ভোজনস্থান পরিষ্কার করা—সকলের ঘৃণার পাত্র মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্বক মন হইতে অভিমান অহঙ্কার পরিহারের জন্য অশুচি স্থান ধৌত করা—চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্যন্ত সকল পদার্থ পঞ্চভূতেব বিকারপ্রসূত জানিয়া হেযোপাদেয়জ্ঞান দূর করিবার জন্য জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা নির্বিকারচিত্তে স্পর্শ করা প্রভৃতি যে-সকল অশ্রুতপূর্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়,

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

তাহাও এইকালে সাধিত হইয়াছিল। প্রথম চারি বৎসরের ঐসকল সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে কি অসাধারণ আগ্রহ ঐকালে আধিপত্য করিয়াছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হয় যে, অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি ঐকালের ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণদর্শনলাভপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার চরম ফল করগত করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকল মিলাইতেই পরবর্তীকালে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের এইকালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত, (১) সূক্ষ্মদেহে কীর্তনানন্দ

নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, ঐ মনই তখন তাহার গুরু হইয়া থাকে। ঐরূপ শুদ্ধ মনে যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে-সকল বিপথগামী করা দূরে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের আজন্ম পরিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই তাঁহাকে ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন্ কার্য করিতে হইবে এবং কোন্‌টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক পৃথক্ এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয়

প্রদর্শনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কৃতকার্যের ফলাফল জানাইয়া দিত! ঐ কালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিত-ত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "অন্য চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!" অন্য এক সময়ে দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন! দূরস্থ দেবদেবীর মূর্তিদর্শনে অথবা কীর্তনাদিশ্রবণে অভিলাষী হইয়া ঐ সন্ন্যাসী যুবক কখন কখন ঐরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পথে ঐসকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ত্ম-অবলম্বনে আসিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন!—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশলাভ

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের অপূর্ব অনুভব-প্রত্যক্ষাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি একদিন ঐ বিষয় আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছিলেন: "আমারই ন্যায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। সে ঐ বাহিরে আসিলে

কখন সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা উহা এ পূর্ব হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা মচন্দ্র এবং শুনিতে পাইতাম। তাহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম সেইসকল তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ন্যাঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, শাস্ত্রবিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঐ বিষয়ক আর একটি অপূর্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শিবিকারোহণে কামারপুকুর হইতে সিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাটীতে যাইবার কালে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হয়। উহারই কথা এখন পাঠককে বলিব—সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতলছায়াময় অশ্বত্থবট-বৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিত তরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বনপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা

প্রদর্শনপূর্বনর প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত করিতে হ কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া দিত! । বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; এবার নিত্যানন্দের ত্রিশখালে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন। সেইজন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল।" হৃদয় বলিত, ঐকথা বলিযা ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বাব বার
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমাব ॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

আমরা এক দিবস তাঁহাকে ঐ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ দেখিযাছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল, একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি, বল?" যাহা হউক, ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে সুপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়া প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছে। ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাস তিনি এখন পাইতেছিলেন,

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়

তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্য নূতন শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ হইযাছিল, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে—রাজা যেমন কখন কখন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বহির্গত হয়, সেইরূপ গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমন করিযাছে।"

পূর্বোক্ত দর্শনটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন, তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনটির কথা ছাড়িয়া দিলে তাহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি।

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখনও মিথ্যা হয় নাই

কারণ, ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরেজী-শিক্ষিত সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ ঐসকল পরীক্ষা করিতে যাইয়া প্রতিদিন পরাজিত ও স্তম্ভিত হইত। ঐ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ* 'লীলাপ্রসঙ্গে'র অন্যত্র থাকিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয় পূজা-মহোৎসবে

---

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহ্যপ্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস, তাঁহার শরীরই এখন অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া* করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম এ পর্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে এবং যুবক-ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অন্য সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে; আবশ্যক বুঝিয়া কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের দর্শন বিবরণ

অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হইলে শরীরের রক্ত-প্রবাহ ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়া ক্ষতস্থানটিকে নিরন্তর আঘাত-পূর্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্য ঠাকুরকে ঐ উভয় বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও ভ্রমক্রমে তিনি বারংবার উহার বিপরীত কার্য করিয়া বসিতেছেন।

* গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটী

কারণ 'হাড়মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদান-পূর্বক বারংবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার দর্শন পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ কার্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ-আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন, কেহ কেহ আবার নবাগত ব্যক্তিসকলকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্মভাবপ্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ উপায় কিছুকালের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ মত প্রকাশপূর্বক সকলকে নিঃশঙ্ক করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্নে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে, তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায়গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐসকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, "আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে, তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না;

তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না—তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।" (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাঁহাকে তিনি কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; আবার কেহ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অপর সকলে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজার অল্পদিন পূর্বে দুই একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই ঐজন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমীপূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবুর অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

ঐরূপে প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে।' প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন—"এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর

উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা', 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, সে স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহাব যখন সমাধি হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা', 'মা' বলিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল বালকের ন্যায উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।* ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্যঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যেভাবে পরীক্ষা করেন

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের জন্য ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্যভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তাঁহারা লছমীবাই প্রমুখ হাবভাবসম্পন্না সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ

করিয়া এবং তাঁহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐসকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যভঙ্গে প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়

বিবাহ ও পুনরাগমন

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, 'মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে'—ইহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও 'মা', 'মা' রবে কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া প্রতিকারের নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্তিক মাস হইবে।

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 'মা', 'মা' রবে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন এবং কখন কখন

ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চালচলন ব্যবহারাদি কখন সাধারণ মানবের ন্যায় এবং কখনও উহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। ঐ কারণে এখন তাঁহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও মাতৃভক্তি এবং বয়স্য-প্রেমের একদিকে যেমন প্রকাশ দেখা যাইত, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, সাধারণের অপরিচিত বিষয়-বিশেষ লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়শূন্য হৃদয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকের মনে উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের ধারণা

ঠাকুরের মাতা সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে পূর্বোক্ত কথা ইতিপূর্বে কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন— "একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল, বলিল, যদি ভূত হয় তো পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই।'—পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারি খাও কেন? অধিক সুপারি খাইলে কামবৃদ্ধি হয়।' ইতিপূর্বে সত্যই আমি সুপারি খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম, চণ্ডের কথাতে উহা

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান

তদবধি ত্যাগ করিলাম।" ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি বারংবার লাভ করিয়াই তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। অতঃপর ঐসকল কথা আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণসম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত 'ভূতির খাল' এবং 'বুধুই মোড়ল' নামক শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি একাকী অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশের কথাও তাঁহার আত্মীয়েরা এইকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবতা-দিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নূতন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্বক ঐ স্থানদ্বয়ে গমন করিয়া বলি নিবেদন করিবামাত্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহার্যপূর্ণ হাঁড়িসকল বায়ুভরে ঊর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত। ঐসকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে কোন কোন দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উহাতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, "যাচ্ছি গো, দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর

হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেবতারা) তোমার অপকার করিবে।" ভূতির খালের পার্শ্বস্থ শ্মশানে তিনি এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল, তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গের ঐসকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদম্বার দর্শনলালসায় তিনি ইতিপূর্বে যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কতকগুলি অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিযা মনে হয, শ্রীশ্রীজগদম্বাব অসি-মুণ্ডধরা বরাভয়করা সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্তির দর্শন তিনি এখন প্রায় সর্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতে-ছিলেন, তাহার উত্তর পাইযা তদনুযাযী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাধামাত্রশূন্য নিরন্তর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরে উপস্থিত হইবে।

ঐকালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা

ভবিষ্যৎ দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা ঐ ক র ইঙ্গিত কখন কখন পাইয়াছি। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল, দৈবকৃপায় তাঁহার বায়ুরোগের এখন অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে

জনসাধারণের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। সর্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিধেয় বসন ত্যাগপূর্বক কখন কখন ধ্যান পূজাদির অনুষ্ঠান এবং ঐ বিষয়ে কাহারও নিষেধ না মানা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবহার অনন্যসাধারণ হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া ঐসকলে তাঁহারা বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কারণ দেখেন নাই।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সঙ্কল্প

কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং নিরন্তর উন্মনাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে, ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃপুনঃ উদিত হইত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে তাঁহার মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ না করিয়া নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধনেই রত থাকিবে।

গদাধরের বিবাহে সম্মতিদানের কথা

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালকবালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে

কিংকর্তব্য জানিয়াই কি তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন, অথবা বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার ঐরূপ করিবার কারণ? পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা ঐ সম্বন্ধে অন্যত্র যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি।*

যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া গেল, তাহাদের পিতামাতা অত্যধিক পণ যাজ্ঞা করায় রামেশ্বর ঐসকল স্থানে ভ্রাতার বিবাহ দিতে সাহস করিলেন না। ঐরূপে বহু অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন, তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া গদাধর এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রক্ষিতা আছে।"*

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রী-নির্বাচন

ঐ কথায় বিশ্বাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুরের দুই

বিবাহ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়
* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে সম্পন্ন কবিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল, অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরলহৃদয়া ধর্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নব বধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি

এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, "আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?" চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, "মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে।" এইখানেই কিন্তু ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "উহারা এখন যাহাই বলুক ও করুক না, বিবাহ তো আর ফিরিবে না।"

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন

বিবাহের পর ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথানুসারে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গমনপূর্বক শুভাদিন দেখিয়া পত্নীর সহিত একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে 'যোড়ে' আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে কামারপুকুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব-অনটনের কথা

তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঐ কারণে তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া তিনি কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েকদিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন—এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্বক্ষণ আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল। তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐপ্রকার অবস্থা ইতিপর্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ অবস্থা

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুরবাবুর নিদেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে নানাপ্রকার ঔষধ ও তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও, হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে

লাগিলেন। পূর্ববঙ্গীয় অন্ত একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি; ঔষধে সারিবার নহে।'* ঐ বৈদ্যই ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান আমার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার কথায় আস্থা প্রদান করে নাই।" ঐরূপে মথুরবাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির জন্য চিন্তান্বিত হইয়া নানারূপে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হয় নাই।

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট হত্যা দিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাহারই মন্দির-প্রান্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। 'মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে'—তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐ স্থানে গমনপূর্বক পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্বে কামনাপূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদৃষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বরপরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন—'ভয়

* কেহ কেহ বলেন, ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে।' ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক বিকার শান্তির জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলামাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতিবৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

ঠাকুরের এইকালের অবস্থা

ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে কত সময় বলিযাছেন—"আধ্যাত্মিক ভাবেব প্রাবল্যে সাধারণ জীবেব শরীব-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীরত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সমযে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল, তাহাব জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত, ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল?' শরীরে বিষম

ব্যাধি দিলি ?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হক্‌গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই।' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম।"

শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুরবাবু এই সময়ে একদিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্তি সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐদিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তি-প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে 'ধর্মগ্লানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি-সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

মথুরবাবুর ঠাকুরকে শিবকালীরূপে দর্শন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী সমাগম

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহাব জীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগেব আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হযেন। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পডিয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া উক্ত রোগের সঞ্চার করে। ব্যাধি স্বল্পকাল মধ্যে সাংঘাতিক ভাব ধাবণ করিয়াছিল।

রাণী রাসমণিব সাংঘাতিক পীডা

আমরা ইতিপূর্বে বলিযাছি, সন ১২৬২ সালেব ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসেব ৩১শে তারিখ বৃহস্পতিবার বাণী দক্ষিণেশ্বরে দেবী-প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাটীর ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংবাজী ২৯শে আগস্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারি দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও এতদিন তিনি ঐ সম্পত্তি

রাণীর দিনাজপুরেব সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু

* Plaint in High Court Suit No 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment

দানপত্র করিয়া দেবোত্তরে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয় শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। দানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উক্ত সম্পত্তিব অযথা নিয়োগেব পথ এককালে রুদ্ধ করিবার মানসে নিজ কন্যাদ্বয়কে দেবোত্তর করিবাব সম্মতি প্রদানপূর্বক ভিন্ন এক অঙ্গীকারপত্র সহি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা উক্ত পত্রে সহি প্রদান করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি বহু অনুবোধেও উহাতে সহি দিলেন না। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেবোত্তর-দানপত্রে সহি করিলেন* এবং ঐ কার্য সমাধা করিবার পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়াবি তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

executed by Rani Rasmani.—According to my late husband's desire * * *I on 18th Jaistha, 1262 B. S. (31st May, 1855) established and consecrated the *Thakurs* ..and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaris in District Dinajpur on 14th Bhadra, 1262 B. S. (29th August, 1855) for Rs. 2,26,000."

The Dead of Endowment, dated 18th February, 1861 was executed by Rani Rasmani; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of 1867,

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোশনাই আর ভাল লাগছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা, এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে, মা?" ঐ কথার উত্তরপ্রদান করিয়াই যেন শিবাকুল ঐ সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শরীররক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদবিসংবাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া কেন এত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐসকল মকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন, তাহাই হইতে বসিয়াছে

Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni and in the High Court Suit No. 308 of 1872, Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th July, 1888.

ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্তি ঐ বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়সংক্রান্ত সকল কর্মপরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল হইতে তিনি কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ব্যয় বুঝিয়া লইয়া রাণীর ইচ্ছামত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই দেবসেবা-সংক্রান্ত সকল কার্য পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাবে দেবতাভক্তি মথুরামোহনের অন্তরে বিশেষ অধিকার বিস্তার করায় দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা রাণীর মৃত্যুতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

মথুরবাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত

ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি, অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্যলাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, ভক্তিমান মথুর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিবার বিশেষ অবসরপ্রাপ্ত হইয়া-

মথুরবাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্য

*Debt due on mortgage by the Estate is Rs, 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876-0-0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

ছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপত্যলাভ যেন ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দেখা যায়, দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাঁহার নিকটে সর্বপ্রধান কার্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সমভাবে এক বিষয়ে বিশ্বাসী থাকিয়া উচ্চভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভবপর হয়। অতএব রাণীর বিপুল বিষয়ে একাধিপত্য লাভপূর্বক বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতব বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন হইতে দীর্ঘ একাদশ বৎসবকাল তাঁহার সেবায় আপনাকে সমভাবে নিযুক্ত বাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাব পরম ভাগ্যের কথা বুঝিতে পাবা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ও মথুরের ধারণা

ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পাবে নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিযা স্থিব কবিয়াছিল। কারণ, তাহারা দেখিয়াছিল, তিনি সর্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখলাভে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর একটা অনির্দিষ্ট ভাবে বিভোর থাকিয়া কথন 'হরি', কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' 'কালী' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আবাব রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া কত লোক ধনী হইয়া যাইল, তিনি কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উন্মাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন? একথা কিন্তু সকলে বুঝিয়াছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অকর্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে,

সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে তাহারা যে-সকল ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সেইসকল লোকের সম্মুখে ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হন এবং অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন। ইতরসাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুরবাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর আগমন

সযত্ন-রক্ষিত ঐ উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে ভূষিত হইয়া বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং মাল্যরচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনি-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি বাঁধাঘাট ও নহবৎখানা অদ্যাপি বর্তমান। বাঁধাঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায় লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দেশ করিত।

ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা

আলুলায়িত-দীর্ঘকেশা ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী উহা হইতে অবতরণপূর্বক দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনির দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রৌঢ়া হইলেও যৌবনের সৌন্দর্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ করে নাই। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাঁদনি হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া বলিলেই আসিবে।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। কারণ তাঁহাকে ঐরূপ আচরণ করিতে সে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া হৃদয় চাঁদনিতে যাইয়া দেখিল ভৈরবী ঐস্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কথা শুনিয়া ভৈরবী কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া সে অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সজলনয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে, মা?" ভৈরবী বলিলেন, "তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে একথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুইজনের দেখা পূর্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।"

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন অন্তরের কথা জননীর নিকটে সানন্দে প্রকাশ করে, সেইরূপ নিজ অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা, শারীরিক বিকার প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনুভূত বিষয়সকল তাঁহাকে বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, আমার এসকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" ভৈরবী তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা এবং কখন করুণার্দ্রহৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? সেইজন্য ঐ প্রকার বলে। ঐপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ প্রকার হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে যে-সকল পুঁথি আছে, তাহা হইতে আমি পড়িয়া দেখাইব, ঈশ্বরকে যাঁহারা একমনে ডাকিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই ঐরূপ

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ

আচরণসকল হইয়াছে ও হয়।" ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফলমূল মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া স্বয়ং ঐসকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা, চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব দর্শন

রন্ধন শেষ হইলে ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সময়ে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐপ্রকার কার্যকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকৃত কার্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাপু, আত্মহারা হইয়া কেন এইরূপ

কার্যসকল করিয়া বসি!" ব্রাহ্মণী তথ ় হইয়াছিল, অসাধারণ প্রদানপূর্বক বলিলেন, "বেশ করিয়াচ ়সকল উপস্থিত হইয়াছে। তোমার ভিতরে যিনি আছে ়ত মুহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্যলোপ ও ় করিতে আমি যাহা দেখি ়দ দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল— ়করিয়াছে এবং কে ়নই সামান্য সাধক নহেন। চৈতন্যচরিতামৃত বাহ্যপূজার আ ় ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-এই বলি য ় দেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ-ভোজ ়াগমনের যে-সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ়র স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃপুনঃ উদিত হইতে লাগিল। ়বী ব্রাহ্মণী ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে-সকল ় লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচারব্যবহার অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি মিলাইয়া সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। ়তন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব ় করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার ঈশ্বর-় শ্রীচৈতন্যদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে স্রক্চন্দনাদি ় পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রশমিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ়রের গাত্রদাহপ্রশমনের জন্য ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তিনি তদ্রূ ় পাইলেন।* সুতরাং তাঁহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হইল, ়চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীর-় আশ্রয়ে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার ়ল ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে যেরূপ

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি।* ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

উদাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না, প্রাণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা প্রকাশে লোকের নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা রাখিতেন না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা তিনি সকলের সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিতা হয়েন নাই। শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুরবাবুর সহিত বসিয়াছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহাব সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরমোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি যাহাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই? সুতরাং তাঁহার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, এ কথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার

---

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ব্রাহ্মণী কোথা হইতে একথালা মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যেভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেইভাবে তন্ময় হইয়া অন্যমনে তাঁহাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুরবাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি যত্নপূর্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালাটি প্রদান করিলেন। তখন মথুরবাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে যাহা বল সেই সব কথা আজ ইহাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার তো দশটি ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন তো? বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার শরীর-মনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর সকলেই

জানিতে পারিল এবং উহা লইয়া একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। উহার ফলাফল আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সহসা দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ মতামত প্রদান করেন, তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই বৈষ্ণবচরণপ্রমুখ পণ্ডিতসকলের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। তাঁহাদিগেব নিকটে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিযাছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিযাছি।†

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কারণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম ও ষষ্ঠ অধ্যায় এবং উত্তবার্ধ, ১ম অধ্যায

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

়কিলে

কিন্তু

র্শন

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন

কেবলমাত্র তর্কযুক্তিসহায়ে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করেন নাই। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুবকে দর্শন করিবার বহু পূর্বে তিনি ঐরূপ পত্যাদেশলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন-পূর্বক স্বল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে ঐরূপে বুঝিতে সহায়তা করিয়াছিল। আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাব সহিত তিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে ঠাকুরকে কিভাবে কতদূর সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অতএব ঠাকুরে সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া ঠাকুর যাহাতে দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

সাধনপ্রসূত দিব্য-দৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল

গুরু-পরম্পরাগত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র অনুরাগ-সহায়ে ঈশ্বরদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুর নিজ উচ্চ

তা,

হা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিতেছেন না, প্রবীণা সাধিকা ব্রাহ্মণীর পক্ষে কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকলকে মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল বলিয়া এবং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির জন্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সন্দেহ ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে নির্মুক্ত কবিবার জন্য ব্রাহ্মণী এখন তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং অনুষ্ঠানসহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফলসমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনাসহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভূমিসমূহে যত আবোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হয়। ফলে ইহা দাঁডাইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি ঐ সকলকে সত্য ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্রসাধন করিতে বলিবার কারণ

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতারপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যত হইলেন? ঐশমহিমাসম্পন্ন অবতারপুরুষকে সর্বতোভাবে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে

ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্বদা সমুদিত থাকিলে তাঁহার মানসিক ভাব বোধ হয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী অপত্যনির্বিশেষে ঠাকুরকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান ভুলাইয়া প্রিয়তমের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত করাইতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব বুঝা যায়, অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইযাছিলেন। দেব-মানব, অবতার পুরুষসকলের জীবনালোচনায আমরা সর্বত্র ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক ঐশ্বর্যজ্ঞানে সমযে সমযে স্তম্ভিত হইলেও, পরক্ষণে উহা ভুলিযা যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অন্য সাধারণের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞানে তাঁহাদিগের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছেন। অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ-দর্শনে সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্রাহ্মণীর হৃদয়নিহিত কোমলকঠোর মাতৃস্নেহকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে সুখী করিবার জন্য সকল বিষয়ে সহায়তা করিতে সতত অগ্রসর করিত।

অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন

যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ স্বতঃ উদিত হয়। সুতরাং ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধিকারীকে শিক্ষাদানের অবসর পাইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা

বাৎসল্যভাব—অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

জগদম্বার অনুজ্ঞা-লাভে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান—তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ

তন্ত্রোক্ত সাধনসকল-অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই, সাধনপ্রসূত যোগদৃষ্টিপ্রভাবেও তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় প্রণালী-অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন ঐরূপে ব্রাহ্মণীনির্দিষ্ট সাধনপথে এখন পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষতা কোথায়? অন্তঃসমুদ্রের ঊর্মিমালার বিচিত্র রঙ্গভঙ্গে ভাসমান না থাকিয়া উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য সর্বস্ব ছাড়িয়া নিমগ্ন হইবার অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়? 'একেবারে ডুবিয়া যা', 'আপনাতে আপনি ডুবিয়া যা' বলিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার যেভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মায়ামমতা উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া, 'মা, দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ

করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐ ভাবের বিরাম হইত না, তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—এ কথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহেব পবিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা পাঠককে কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব।

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আশন-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহাব কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধন-কালের আগ্রহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন

হইয়া রহিল এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প-সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্বামীজীর ঐরূপ অপূর্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও সাধনোৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা নিত্য করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামীজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্রের অনুরাগ উৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড় (বেগ) আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না।" ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার তো কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিকক্রিয়োপ-যোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উহাদিগের প্রযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস করিতে লাগিলেন। মনুষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল* গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে

* ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥ ৫১
নর-মহিষ—মার্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২

সমাহৃত হইয়া ঠাকুববাটীর উদ্যানে উত্তরসীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা † নির্মিত হইল এবং প্রয়োজন মত ঐ মুণ্ডাসনদ্বযেব অন্যতমেব উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুবের কাল কাটিতে লাগিল।

শিবাসর্পসাবমেয়বৃষভাণাং মহেশ্বরী।
নবমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি জীবিতম্ ॥ ৫৩
অথবা পবমেশানি নবাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তং। শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈব চ ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপযিত্বা প্রোথযিত্বা ধবাতলে ॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পযেৎ।
আযামপ্রস্থতো দেবী চতুর্হস্তৌ সমাচবেৎ ॥ ৫৬
যোগিনীতন্ত্রম্—পঞ্চমপটলঃ

† সচবাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটি বেদিকা নির্মাণ কবিযা সাধকেবা জপধ্যানাদি অনুষ্ঠান কবিয়া থাকেন, ঠাকুব কিন্তু দুইটি মুণ্ডাসনেব কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিল্বমূলেব বেদিকাব নিম্নে তিনটি নবমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদীর নিম্নে পঞ্চপ্রকাব জীবেব পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে, তিনি মুণ্ডকঙ্কালসকল গঙ্গাগভে নিক্ষেপপূর্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ কবিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসন প্রশস্ততব বলিয়া হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে অধিকতর নির্জন থাকায় বিশেষ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানেব সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক, দুইটি আসন নির্মিত হইয়াছিল। বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানীর বারুদখানা বিদ্যমান থাকায, হোমাদিব জন্য তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধা হওয়ার দুইটি মুণ্ডাসন নির্মিত হইয়াছিল, এরূপও হইতে পারে।

কয়েক মাস দিবারাত্র কোথা দিয়া আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্ভুত সাধক ও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন,* "ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দূরে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত এবং ঐ সকল পদার্থের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া জপধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্রায়ই করিতে পারিতাম না, মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

পঞ্চমুণ্ডাসন-নির্মাণ ও চৌষট্টীখানা তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান

"একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে বলিতেছে, 'বাবা, ইঁহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর।' পূজা সাঙ্গ হইলে বলিল, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী

স্ত্রী-মূর্তিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি

* ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপ কর!' তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলাম, 'মা, তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? দুর্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?' ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্যবলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের ন্যায় কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! অনন্তর যখন জ্ঞান হইল তখন ব্রাহ্মণী বলিল, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে, বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!' শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল। তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যেদিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায়?' শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও ঘৃণার উদয় হইল না।

ঘৃণাত্যাগ

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী কত প্রকারের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যে দিন সুরতক্রিয়াসক্ত নবনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিবশক্তির লীলাবিলাসজ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন।' উহার কিছুকাল পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণাদানে প্রসন্না করিয়া তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্বজনসমক্ষে কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র 'কারণ' গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'যোনি'-শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা এবং তন্ত্রোক্ত-সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন। সিদ্ধজ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে ঐরূপ মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গল্পটি তাহারই বিবরণ। মদস্রাবিগজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটির উপর ইতিপূর্বে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ

শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানসম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

হইতে উহা শুনিয়া পর্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীশ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য।

কিশোরবয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।" মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলি[illegible] কি কথা, মা! আমি তোমাকে কখন প্র[illegible] কান দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়াও [illegible] অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে [illegible] হইবে?" জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন [illegible] ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার [illegible] কিনা?" গণেশ বলিলেন, "তাহা করিয়াছি, অল্পক্ষণ হইল একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।" যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বলিলেন, "তাহা নহে, বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু আমিই মার্জারাদি যাবতীয় প্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ,

সেজন্য দুঃখ করিও না ; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, স্ত্রীমূর্তিবিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তিধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই !" গণেশ মাতার ঐ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণা করিয়া থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

গণেশ ও কার্তিকের জগৎপরিভ্রমণ-বিষয়ক গল্প

পূর্বোক্ত গল্পটি বলিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন : কোন সময় শ্রীশ্রীপার্বতী দেবী নিজ বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া গণেশ ও কার্তিককে বলেন যে, চতুর্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। শিখিবাহন কার্তিকেয় অগ্রজের লম্বোদর স্থুল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়া বিদ্রূপহাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া ময়ূরারোহণে জগৎ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্তিক চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর কার্তিক ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্বতীদেবী প্রসাদী রত্নমালা গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশপূর্বক তাঁহার গলদেশে উহা সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।

ঐরূপে শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব, সেইজন্য বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার মাতৃমূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তন্ত্রোক্ত বীরভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতালাভ একান্ত অসম্ভব। নিজ পাশব প্রবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধকেরা কখন কখন পরকীয়াশক্তি-গ্রহণেও বিরত থাকেন না। লোকে এজন্য তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দিষ্ট বীরাচার-মতের নিন্দা করিয়া থাকে।

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজসম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, আজীবন তিনি কখন স্বপ্নেও স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই। অতএব আজন্ম মাতৃভাবাবলম্বী ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাফল্যলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। 'সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তি-গ্রহণ না করিয়া

বীরাচারের সাধনকালে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্যলাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পঞ্চ'ম'কার বা স্ত্রীগ্রহণ ঐসকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুবল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরমকারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

শক্তিগ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়

অতএব রূপরসাদি যে-সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযম-সহায়ে বারংবার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা নহে—একথা লোকে কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এইসকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে,

তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-সকলের উদ্দেশ্য

তাহার নির্দেশ লাভপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুরেব তন্ত্রসাধনেব অন্য কারণ

ঠাকুর এই সময়ে তন্ত্রোক্ত রহস্যসাধনসমূহের অনুষ্ঠান কিঞ্চিদধিক দুই বৎসবকাল একাদিক্রমে করিলেও, উহাদিগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐসকল কথার অল্পবিস্তব আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিগত প্রযোজন বুঝিয়া বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কবাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-সকলের অনুষ্ঠানপূর্বক অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে উত্তবকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পাবিবেন না বলিয়াই যে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুবকে এসময এই পথেব সহিত সম্যক্ পরিচিত করাইয়াছিলেন—একথা বুঝিতে পারা যায। শবণাগত ভক্তদিগকে কিভাবে কতরূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র* প্রদান করিয়াছি, তৎপাঠে আমাদের পূর্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহাব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুবের দর্শন ও অনুভবসমূহ

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুব তাঁহাব তন্ত্রোক্ত সাধনকালেব অনেকগুলি দর্শন ও অনুভবেব কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমবা এখন উহাদিগের কয়েকটি পাঠককে বলিব।

---

*গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম ও ২য় অধ্যায়

তিনি বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব স্বভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিযা এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিযা তিনি ঐকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না।

শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া তিনি ঐকালে আপনাকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞানাগ্নি-পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন।

আপনাকে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দর্শন

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মস্তকে উঠিবারকালে মূলাধারাদি সহস্রার পর্যন্ত পদ্মসকল ঊর্ধ্বমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে*—এবিষয় ঠাকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষমূর্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইযা জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিযা উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করাইয়া দিতেছেন।

কুণ্ডলিনী-জাগরণ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষয়ে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনিদর্শন হইয়াছে,

ব্রহ্মযোনি দর্শন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এ বিষয় ঠাকুর এইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এইকালে তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন। স্ত্রীযোনির মধ্যে তিনি এইকালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

ও
অনাহতধ্বনি শ্রবণ

কুলাগারে
৺দেবীদর্শন

এইকালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐসকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন, উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তিনি বলিতেন, ঐরূপ দর্শন করা পর্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়।

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিকালের অনুভবপ্রসঙ্গে একটি কথা আ দর মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু আমি ঐসকলের কখনও প্রয়োগ করিব না, একথা বহু পূর্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না, তোকে ধর্মপ্রচারাদি

অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুরের কথা

অনেক কার্য করিতে হইবে, তোকেই ঐসকল দান করিব স্থির করিয়াছি —গ্রহণ কর।" স্বামীজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, ঐসকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহাযতা করিবে কি ?" পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্মপ্রচারাদি কার্যে কিছুদূর পর্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহাযতা করিবে না, তখন তিনি ঐসকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার ঐ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতব প্রসন্ন হইযাছিলেন।

মোহিনীমায়া দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনীমাযার দর্শন কবিবাব ইচ্ছা মনে সমুদিত হওয়ায় ঠাকুর এইকালে দর্শন করিযাছিলেন—এক অপূব সুন্দবী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন, ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগভা, পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন, পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইযা ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্তির সৌন্দর্য

পূর্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুব এইকালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিযাছিলেন, তাহার ইযত্তা হয় না। উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্বস্বরূপা হইলেও শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোডশীমূর্তির সৌন্দর্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না— একথা আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—"ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত

ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম।" এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি নানা দেবমূর্তি-সকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে।

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এইকালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐসকল কখন যে কোথায় পড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকা বশতঃ তাঁহার শরীরবোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্বক তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই বা অন্যত্র দৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন। বলিতেন—"তুলসী ও সজিনাগাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।"

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধ রাহিত্য ও বালক ভাবপ্রাপ্তি

এইকাল হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঠাকুরের অঙ্গকান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র লোক-নয়নের আকর্ষণের

বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে এত বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি উক্ত দিব্যকান্তি পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—"মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর।" তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।† ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মলাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর ও হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "বেশ তো বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব।"

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঐকালের প্রারম্ভ হইতে মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঐকালের পূর্বে মথুর বারংবার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহি াকুরের মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কি না, ত াঁহিতকে তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তন্ত্রসাধনকাল না মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তালোচন অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া এ

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ

তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার ইষ্ট তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহাবলম্বে তাহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা

ও গৌরব-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত দেবসেবা ও অন্যান্য সৎকর্মে মথুরের এইকালে বহুল অর্থব্যয় করা বিচিত্র নহে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব উৎসাহ ও বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতি এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র ে রিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গূঢ় (শ্রীশ্রীযো প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হইত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু তত্ত্বসতাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, উপলব্ধি হ, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সম্বল এবং তাঁহার বৈষয়িক উত্তরকালদমর্যাদালাভের মূলীভূত কারণ।

কৃতার্কুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত উ! করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত .র্যে পাইয়া থাকি। 'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত'-শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এইকালে (সন ১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে

দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐসকল গায়ক-গায়িকার ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত-শ্রবণে তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপকস্বরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

মথুরের অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান

পূর্বোক্ত ব্রতানুষ্ঠানের স্বল্পকাল পূর্বে ঠাকুর বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের গভীর পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানিতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, অন্নমেরুব্রত-কালে আহূত পণ্ডিতসভাতে পদ্মলোচনকে আনয়ন ও দানগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়া মথুর উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিতে হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন নানা-কারণে মথুরের ঐ নিমন্ত্রণগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তার বলিয়াছি।*

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ

তান্ত্রিকসাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।† ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

† ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী-অবলম্বনে বৈষ্ণবমত-সাধনা। ইহার পূর্বে তিনি হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেরণায় দাস্যভক্তির সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। (১৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা) —প্রঃ

আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম—ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয়পূর্বক তন্ময়চিত্তে অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে ভোজন করাইবার কথা আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণবমত-সাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহপ্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়—বৈষ্ণবকুলসম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণবভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর-অঞ্চলে ঐসকল সাধন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ—ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষ-প্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন এবং পরিমাণ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত। শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাঁহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপ বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

ঠাকুরের বৈষ্ণবমতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবা-

বনগমনে সাধনে স্বয়ং প্রবর্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় এইকালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখারূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎকালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে এক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতিভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এইকালের মত দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না, কারণ, স্ত্রী-পুংপ্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং তদতীত অদ্বৈতভাব-মুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য ঐসকল ভাবের যেটিতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

বাৎসল্য ও মধুর ভাবসাধনের পূর্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইযা বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিযাছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিযাছিলেন যে, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিযা সংসারধর্ম পালন করিযা আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদিত হয নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইযা পডিতে লাগিল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্বক তাঁহাকে সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্যবস্তুসকলের কোনটি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরূপ করা তাঁহার যে সুকঠিন হইত, একথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনা

সর্ববিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথা

পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য 'চালকলাবাঁধা' বা অর্থোপার্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়, একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কখন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরবান হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল-সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন—ঐরূপ অনেক কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐসকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্ব-সংস্কারসকল তাঁহার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখনও সমর্থ হইত না।

ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান ও যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরে গোঠে ব্রজে তিনি ঐসকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব ও সম্পূর্ণ

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল

ধারণারূপ দৈবী সম্পত্তিনিচয় নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, তিনি সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকালমধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্য-বস্তু বিচারপূর্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হইল। সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্বক স্নানাদি না করিলে আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহ অপেক্ষা তিনি কোন অংশে বড় নহেন। জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণাপূর্বক ঠাকুর যেমন শুনিলেন, তিনিই 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও ভোগ-

লালসার চক্ষে দেখিয়া দাম্পত্য সুখলাভে অগ্রসর হইতে পারি প্রদায়ভুক্ত
ঐসকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণ গুপ্ত হইয়া
থাকিলে তিনি ঐরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। হইতে
জীবনের ঐসকল কথা শুনিয়া আমরা যে বিস্মিত হই অথবা সহসা শ্রীমুখে
করিতে পারি না, তাহার কারণ—আমরা ঐসময়ে আমাদিগের অন্তর
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রা
সহস্রবার জলে বিসর্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না—
সহস্রবার কদর্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত
হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা
আজীবন শুনিলেও কার্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয়
হইবে না। আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্বকৃত কর্মসংস্কারের নিতান্ত
নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমরা এসকল বিষয়ে ঠাকুরের
ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্বসংস্কার-
প্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হই—
ফলও সুতরাং তাঁহার ন্যায় লাভ করিতে পারি না।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্বশক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি-পাঁচ শত বৎসরেও
এক আধটা আসে কিনা সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণাকুশল, পূর্বসংস্কা
নির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব অনুরাগব্যাকুলতা-তাড়িত
হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন-
লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি-
সহায়ে কিরূপ প্রত্যক্ষসকল লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের মত মনের
কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর

ধারণারূপ দৈবী ত শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবায় কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না।
হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য
সাধকের জীবনযাত্রার ধুসেবা নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক,
ভিত্তিরূপে অ অনেক সময় ঠাকুরের নির্দেশে ঐ বিষয়ে তদপেক্ষা
সাধনরাজ্যে ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার
সাধনক শেষ প্রীতি ছিল। কারণ ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায়
.এস সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহ-রক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহার্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র-দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐসকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই মথুরামোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থানবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবাপরিচালককে আশীর্বাদপূর্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে বামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলালা' নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। ঐ মূর্তির বহুকাল সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এতদূর অন্তর্মুখী ও তন্ময়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ঘন বালবিগ্রহ সত্য সত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে ঐরূপ দর্শন মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একপ্রকার নিত্য সহচররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

অনন্তর যদবলম্বনে ঐরূপ পরম সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই রামলালাবিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্বক দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলালা-সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন-মূর্তির সদাসর্বদা দর্শনলাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি একটি ধাতুময় বাল-বিগ্রহের সেবা অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত সর্বক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিয়াছিল। ঐজন্য প্রথম দর্শনেই তিনি জটাধারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সাহ্লাদে প্রদানপূর্বক তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্যমূর্তির দর্শন সর্বক্ষণ পাইতেন, সেই মূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐরূপে জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রবল

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

প্রেরণায় শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকা, পুষ্পহারাদি রচনা করিযা তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামরব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্মাণ কবাইযা তাঁহাকে পরাইযা দেওয়া এবং তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্যে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিপ্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তিনি এখন তাঁহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মূর্তিব দর্শনলাভ করিলেন এবং প্রকৃতিভাবেব প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইল। মাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অপূর্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব কবিয়া থাকেন,

স্ত্রীভাবের উদযে ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওযা

তিনি এখন ঐ শিশুমূর্তির প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ প্রেমাকর্ষণই তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইযা কিরূপে কোথা দিযা সময় অতীত হইতেছে, তাহা জানিতে দিত না। তাঁহার নিজ মুখে শ্রবণ করিযাছি, ঐ উজ্জ্বল দেবশিশু মধুময বালচেষ্টায় ভুলাইয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রযাস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিযা তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত।

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্যের অর্ধেক নিষ্পন্ন করিযা ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে তিনি

উহার চরম সীমা পর্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্ত তাঁহার চেষ্টা—ঐরূপ করা কর্তব্য কি-না

তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়তো ভাবিয়া বসিবেন—'কিন্তু উহা কি ভাল? যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে? দুর্বল মানবের অন্তরে সু ও কু সকল প্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র স্বভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করা মানবের কখনই কর্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।'

পূর্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও কর্তব্য নহে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতর-সাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমের আবশ্যকতাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর-কৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদিগের মন তখন কাম-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাবসংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ

কেবলমাত্র স্বভাবসমূহের নিবাসভূমিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলিতেন —শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তখন তাঁহার কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্তোলনপূর্বক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না, 'মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।' ঐরূপ অবস্থাপন্ন মানব তৎকালে অন্তরের প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলে তাহা দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অপরের বিশেষ কল্যাণই সংসাধিত হয়। কারণ দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের মত বিসর্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বিরাট ঈশ্বরের সর্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণ-সাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। ফলেও দেখা যায়, তাহাদিগের ঐ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না— ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তিতর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্বক অনেক সময় কার্যে

অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বিরাট ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে সর্বদা অভিন্ন রাখিয়া তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির বিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কিভাবে কাহার দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে, তদ্বিষয় পর্যন্ত পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়া ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্যসম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনক-তনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া তাঁহাকে বনে বিসর্জন করিলেন। আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জন করিলে নিজ লীলাসংবরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও ঐ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে' পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষ-পত্রান্তরালে সর্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমন-ভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীররক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্বাণপ্রাপ্তির কথা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকারপূর্বক আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা

তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎপ্রচারিত ধর্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও মাতৃষ্বসা আর্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাহার শরীরধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

অবতারপুরুষদিগের তো কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অবতারপুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার ও অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তগত স্বার্থ-সংস্কারসমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন এমন এক পবিত্র ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহে কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্তমনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস-স্থাপনপূর্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবনপরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থদুষ্ট বাসনার উদয় হয় না

নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থ-বাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্টবীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন উৎপন্ন হইতে পারে না, পুরুষদিগের সংসার-বাসনা তদ্রূপ সংযম ও জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুর ঐ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে উহার হিংসাক্ষম আকারমাত্রই বর্তমান থাকে, উহার দ্বারা হিংসাকার্য আর করা চলে না।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, ঐ প্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সঙ্কল্পসকল সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্মলাভ হইবে বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া

ঐরূপ সাধক সত্যসঙ্কল্প হন, ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তসকল

তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে ঐ কথার বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক বাৎসল্যভাব-সাধন ও সিদ্ধি

আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্বক তদনুরূপ কার্য-সকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বালরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায় তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূবক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুর ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্তির অনুক্ষণ দিব্যদর্শনলাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

'যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা!

ওহি রাম জগৎ পসেরা,

ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।'

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্‌, মায়ারহিত, নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্বোদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাটি আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন জটাধারী 'রামলালা' নামক যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতেছিলেন, তাহা ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ এখন হইতে ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি,* এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলালা' বিগ্রহ দান

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও

বৈষ্ণবমত সাধন-কালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কতদূর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি-না, ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে বাৎসল্য-ভাবে আরূঢা হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শনপূর্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোনপ্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাহার মুখে ঐসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের মনে ঐসকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ স্বীকার করিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ সাধনা সূক্ষ্মভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাদ্‌পদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদিব কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কার-প্রবাহ। আছে কেবল বাহ্যবস্তু বা শক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন কবিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসব হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত সংকল্পপূর্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল বাহ্য-বিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবান্তরসমূহের উপলব্ধি করা এবং পরিশেষে নিজ অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য

যদবলম্বনে সর্বভাবের ও অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মেকমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তুর উপলব্ধি ও তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি-অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য জগতের উপলব্ধিতে এবং উহা হইতে সমাধি-অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতেব আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি সাধক-মনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাঁহাদের পূর্বোক্ত সমাধি-অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি —ইতরসাধারণ মানবেব কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাঁহারা কিছুকালেব জন্য আপনাদিগকে সংসারে, বাহ্যজগৎ উপলব্ধি করিবার ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানেব স্বতঃপ্রবৃত্তি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বু। । তাঁহাব মন পূর্বোক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ-আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ তিনি আমাদিগকে বাবংবার বলিয়া গিয়াছেন, "ছোট ছোট এক-আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া বাখি। নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া অবস্থানের দিকে।"

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ সর্বভাবের অভাব বা 'শূন্য' বলিয়া আবার কেহ কেহ সর্বভাবের সম্মিলনভূমি 'পূর্ণ' বলিয়া নিদেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ সকলেই উহাকে সর্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শূন্যবস্তু বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্কর তাহাকেই সর্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণবস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়।

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্বক সমরস-মগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয়, সে-সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক্ অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ ইহ-পরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীলাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

অদ্বৈতভাবের স্বরূপ

অদ্বৈতভাব ও উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ

দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটিরই সাধ্যবস্তু ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমেব আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসব হয় এবং সর্বান্তর্যামী, সর্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণপূর্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরেব নানা ভাবময চিদ্‌ঘন মূর্তিধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্ট-পূর্ণকবণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওযা যায়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চক এবং উহাদিগেব সাধ্যবস্তু ঈশ্বর

সংসাবে জন্মগ্রহণ কবিয়া মানব অন্য সকল মানবের সহিত যে-সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্ব[illegible] [illegible]াকে, শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, বাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতিব সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতবসকলেব সহি[illegible] শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহাব করা কর্তব্য বলিযা জ্ঞা[illegible] কবি। ভক্ত্যাচার্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত কবিযাছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ কবিতে উপদেশ কবিযাছেন। কাবণ শান্তাদি পঞ্চভাবেব সহিত জীব নিত্য পরিচিত থাক[illegible] তদবলম্বনে ঈশ্ববকে প্রত্যক্ষ কবিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের স্বরূপ—উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে

২—১৬

ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে-সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহাকে সংসারে ইতিপূর্বে নানা কুকর্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেইসকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শনকামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্যবস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেম-সৌন্দর্যের সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব ধর্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক ঐসকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐসকল আচার্যের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোনপ্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈশ্বরের কোন না কোনপ্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা

প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্যজ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাব-সাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য এই পথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-জ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্যের উপলব্ধি করাইতে পূর্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদূর সক্ষম, সেটি ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্বোচ্চ পদবী-প্রদান ভক্ত্যাচার্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটিই যে সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই ভাবসকলের পরিমাপক ৬

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজ-গোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ শরীরত্যাগকালে ঈশাকে যে উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিতে

করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভক্তি-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।* অতএব বুঝা যাইতেছে, শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শান্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরম অদ্বৈতভাব-উপলব্ধি-বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শিক্ষা।

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্তদাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্বভাবাতীত অদ্বয়বস্তুর উপলব্ধি করিবে। কারণ অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোনপ্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য। কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, তত ই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ সময়ে সময়ে বিস্মৃত

* Vide Life of St. Francis of Assisi and St. Catherine of Sienna.

হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি' শব্দ-নির্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচল-ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করে না। উহা এক ক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'-শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয়, ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া, 'তুমি' ও 'আমি'-রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাব-লাভবিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা

শান্তদাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানবমনকে পূর্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐসকল ভাবের এক একটি মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্য-নির্দেশ

শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্ত ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্মসংযুক্ত দাস্তভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের পূর্ণ পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতরদেশীয় ধর্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্ত ও ঈশ্বরের পিতৃভাবসম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলেমানের সখ্য ও মধুর-ভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐসকলের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া থাকে। মুসলমানধর্মের সুফী-সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর-ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরানবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলপ্রদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। ক্যাথলিক সম্প্রদায়গত মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অর্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কোনপ্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের

প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়; ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রদান করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবলপূর্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদিভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানব-জীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকলপ্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব তন্ময়ত্বলাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ

হয় নাই? কারণ তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মানবমনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, অন্তরের পূর্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্বস্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়া আমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন বিরোধী ভাব-সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অন্তঃসংগ্রামের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্মবীরগণের ভাবেতিহাসের

যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইলা ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযমপূর্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্বক 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তের পূর্বসংস্কারসমূহ বিনষ্ট করিতে তাঁহার মানসিক সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে গ্রন্থকার স্থূল বাহ্য ঘটনার ন্যায় 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার ত্রিংশ বৎসরে জন নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্বক বিজন মরুপ্রদেশে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যানতপস্যার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া জয়লাভপূর্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়া ছিলেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূলশরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও, তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুরভাবের চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভগবান শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি-অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায় মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুরভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্তি পর্যন্ত সাধকমনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে-সকল রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায় ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ পরিণতিতে সাধকমন প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভবপূর্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই অথবা উহার সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবস্থা বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস বর্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মভাব যে সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা ও সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকালের জন্য নিঃসংশয়ে ঋণী হইয়াছি।

পূর্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের

আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথপ্রদর্শন না করিলে কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্যগণ

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল হাসিকগণ বলিবেন, বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া ব তোমাদের এতটা হাসি-কান্না, ভাব-মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বৈষ্ণবাচার্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত কবিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যতদিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য-লীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কাম-

র ক্ত াপত্তি াংসা

গন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ অবলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ না, ধর না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা স্বামী, পুত্র, কুল-শীল, মান-অপমান, লজ্জা-ঘৃণা, লোকভয়, সমাজ-ভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল!—ঐরূপ করিতে পারিলে তবে ভগবান লাভ হয়।" আবার বলিতেন, কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য জ্যোতি তাহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি লোমকূপে যে তাহাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!"

বৃন্দাবনলীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে—এ বিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

—স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় ঐতিহাসিকত্বসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা তো মানিস্? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে ঐকালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল এবং বৃন্দাবন লীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।"

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে, চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইবে এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারীদিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয়, যুগবতারগণের সকল কার্য লোককল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের

দ্বারা পূর্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্তন ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করাইতেছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে ঐ ভাব-সাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্বণ করিয়া নিজ শরীর-পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুই প্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরেব মধুরভাবসহাযে তিনি লোককল্যাণ-সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমেব চরম পবিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বযং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যের পুরুষ-জাতিকে মধুর-ভাবসাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগেব অবসানকালে দেশে বজ্রযানরূপ মার্গ এবং ঐ মতের আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচাব করিয়াছিলেন—নির্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্থূল শরীররূপ ভোগায়তনের উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগ-ত্যাগে ভাবরাজ্যে সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূলভোগসুখপ্রাপ্তিকে

ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐসকল বিকৃত বৌদ্ধধর্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার এইকালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐসকল সাধকের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দ-লাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকট ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুলবিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃতবামাচার-অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নত করেন

অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।*

মধুরভাবের স্থূলকথা

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণেব প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্বান্তঃকরণে ভজনা কবিলে তাঁহার কৃপায় তাহার গতিমুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবেব স্থূল কথা। মহাভাবে সর্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক, দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতবাং ব্রজগোপিকাগণেব ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐসকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাসপ্রাপ্ত হইযা ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাব-স্বরূপিণী† শ্রীরাধিকার ভাবানুষ্ঠানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

---

* 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ দেখ।

† কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃত-দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের প্রতি প্রেম, জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ নায়ক-নায়িকা ঐসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্বক নানা কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রাস করিতে সঙ্কুচিত হয় না, স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐসকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঐরূপ সর্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেইজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

স্বাধীনা নায়িকার সর্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে

বৈষ্ণবাচার্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারিপ্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্বক তাহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাহার শরীরমনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়তমের কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্বক তাঁহার মন অপূর্ব

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক

শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসাশ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখেব ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণীশ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

বিষয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সাধকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলে তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—

শ্রীচৈতন্য মধুরভাব-সহায়ে কিরূপে লোককল্যাণ করিয়াছিলেন

সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত "অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার"* নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্য সত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবনসহায়ে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে

* যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চস্বরভেদ

অলঙ্কারশাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুবাক্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাঁহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারসকলের জন্যই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক ঠিক ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুর

বেদান্তবিৎ মধুরভাব-সাধনকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন

বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদা স্যুঃ।—আকরগ্রন্থ

ভাব সম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাহিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইবার পরে, 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন, বেদান্তবাদী দার্শনিকেব চক্ষে ইহাই সর্বথা প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব-সাধনের চরম লক্ষ্য

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্তমানে উহা অস্বীকারপূর্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই বর্তমান। দেখা যায, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্বদা যত্নবতী। আবার

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

দেখা যায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিতুষ্টির জন্য পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থসমূহে এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণবকবিকুলের পূর্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলীসকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

ঠাকুরেব মধুরভাব-সাধন

ঠাকুরের একাগ্রমনে যখন যে ভাবের উদয হইত, তাহাতে তিনি কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ যন্ত্র করিয়া তুলিত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন কবিবার কালে আমরা ঐ বিষয়ের নিত্য পরিচয় পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইলে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওযাতেই যে তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাবসমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাব-তন্ময়তার আচরণ

সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, ঐকালে

পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অ
তাঁহার মন অবলম্বন করিতেছে না, কিন্তু কোণিত হইয়াছে। স্বামী
ভাববিশেষ ক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন—ঠাকুরের এবার
হইলে, যত আভাস পর্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে
গার অবলম্বন করিয়াই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে।

সাধনকালে তাঁর মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্তন হয়

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাতৃ-ভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই, আবার
য় চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাবসাধনে প্রবৃত্ত
মাতৃভাবসাধনা হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ঐরূপ
সর্বত্র দৃষ্ট হয়। আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে
ব্রাহ্মণীর জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্তিসকলে
পূর্ণ ছিল। তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি

সাধনকালের পূর্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না

কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং সময় সময় বালকের ন্যায় ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাঁহার হস্তে
পূর্ব য়িয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে
আহার্য গ্রহণ ধন এইকালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা
শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব
হইয়া মধুর রিতে গ না এবং ঐ ভাব সংবরণপূর্বক মাতৃভাবের ভজনসকল
তাঁহার ভাল লাগে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের
গাহিবার যথাযথ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার
মানসি

ণ কা
ব্রাহ্মণী

আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজ.

স্বর গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতার।

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু তি নন্দরাণী

'ভাবের ঘরে চুরি' যে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছি করিতেন।

উহাতে বুঝিতে পারা যায়। র্বের কথা।

উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে প না. একথা

বাৎসল্যভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠ

বলিয়াছি। অতএব মধুরভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া বর্তিত হইয়া

অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেইসকল কথা আমরা এখন কে ইতিপূর্বে

হইতেছি। তিনি যেসকল

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বলিতে প্রবৃত্ত

'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন

করিয়া আজীবন শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা আমরা যাহাকে

ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়

আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার হইলেও কেমন

নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যেস করিয়া চলিয়া

রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখনও পূর্বে কেবলমাত্র

.হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' কল সাধনানুষ্ঠানে

পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ হইয় উহা নিরর্থক

পরিচয় উহাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঘটনা ঐরূপ হ , এবং ঠাকুর

কারণ শাস্ত্রসমূহ ঐভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে, একথা ব্রজরমণীর ভাবে

বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সত্যবোধ এককালে

উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়া পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপলব্ধিসকলেনি ছয় মাসকাল

বিচিত্র সমাবেশের

হওয়ায় শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ শাস্ত্রসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

শাস্ত্রমর্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ ভাবেব প্রেবণায় ঠাকুবের নানা বেশগ্রহণেব কথাব উল্লেখ করিতে পাবি। উপনিষদমুখে ঋষিগণ বলিযাছেন—'তপসো ব্যাপ্যলিঙ্গাৎ'* সিদ্ধ হওযা যায না। ঠাকুবের জীবনেও দেখিতে পাওযা যায, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইযাছিলেন তখন হৃদযেব প্রেরণায প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধাবণ করিয়াছিলেন। যথা তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধাবণ করিযাছিলেন, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরু-পবম্পরাপ্রসিদ্ধ ভেক বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত ।। বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিযা শিখাসূত্র কাষায ধাবণ কবিযাছিলেন, ইত্যাদি। আবার পুং -

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রমর্যাদা রাখার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নামভেদ ও বেশগ্রহণ

রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচবণ

ালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন,

বলিয়া এতদূর নি চিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায আপনাকে

ভাব রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুব আমাদিগকে বারংবাব শিক্ষা

শ্রীযুক্ত মথুরের ক ঘৃণা, ভয় ও জন্মজন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ

ভবনে উপস্থিত হ, ৩।২।৪—সঃ ।সেব লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধাবণ না

* গুরুভাব—স্যা দ্বাবা আত্মদর্শন হয় না।

ত্যাগ না করিলে কেহ কখন ঈশ্বরলাভ করিতে পারে না। ঐ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন কায়মনোবাক্যে কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় :

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষাধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী শাড়ি এবং কখন ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশগ্রহণ

আবার 'বাবা'র রমণীবেশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান মথুরের ঐরূপ দান ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না—এই বিশ্বাসে পরম সুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবসাধনকালে তিনি ছয় মাসকাল রমণীর বেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের

কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও হৃদয় উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন-কালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেন।

স্ত্রীবেশগ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রীজাতির ন্যায় হওয়া

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের সহিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইতিপূর্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে লজ্জাসঙ্কোচাদি ভাব রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি

মথুরের বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

নিজহস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "তাহারা তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইত না!"

রমণীবেশগ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত

হৃদয় বলিত—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুরবাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদ প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণী বলিতেন—'তাঁহারা ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।' পুষ্পচয়নপূর্বক বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এইকালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐরূপে সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি সম্পাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও

তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিংবা রাত্রি, কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্বদা সর্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্নবাধায় প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবের হৃদয় মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ? উহা তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্তনির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

মধুরভাবসাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে

প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্বক উহার সহিত কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ভোগলালসাপরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা

ভক্তিগ্রন্থসকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীই কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষপূর্বক উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমাজভয় পতিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্যাদা ও নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ জগতে কখন সম্ভবপর নহে, কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রেমে চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং মধুরভাবের পূর্ণ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর প্রেম সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের কথা

ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের দিব্য মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা বহুকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া একাধারে বা একশরীরাবলম্বনে পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ ঙপূর্ণ বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে রাধারাণীর শরীরমনে যেসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইতে দেখিযাই গোস্বামিগণ তাঁহাকে শ্রমতী বলিযা নির্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয দষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিযা ঠাকর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায প্রবৃত্ত হইযাছিলেন এবং তাঁহ প্রেমঘনমূর্তির স্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইযা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতিপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মূর্তি নিজাঙ্গে

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ

সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীব অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের স্থায় গৌরবর্ণ দেখিযাছিলাম।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিযা অনুভব ও তাহার কারণ

উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুব কিছুকালেব জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিযা নিরন্তর উপলব্ধি কবিযাছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্তি ও চবিত্রেব গভীব অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ এককালে হাবাইযাই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয বলিতে পারা যায় যে, তাঁহাব মধুবভাবোত্থ ঈশ্বর এখন পরিবর্ধিত হইযা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইযা দাঁডাইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কাবণ পূর্বোক্ত দর্শনেব পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পবাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইযাছিল। গোস্বামিপাদগণেব গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শাবীরিক লক্ষণ-সকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈববী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐসকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন—"উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে, একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়। (নিজ শরীর

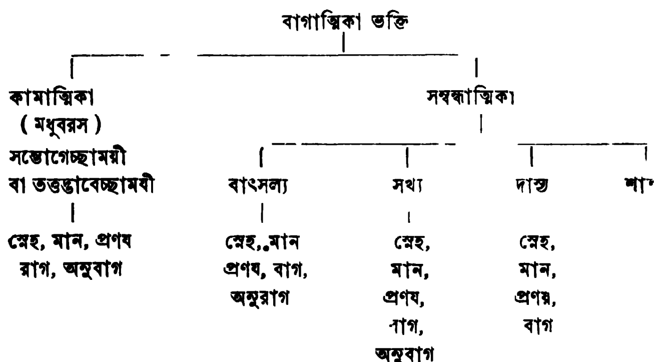
দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐপ্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"*

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরেব শরীরেব অদ্ভুত পরিবর্তন

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এইকালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্যকলাপে তাঁহাব শবীব ও ইন্দ্রিয় স্বতই প্রবৃত্ত

---

* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ বাগাত্মিকা ভক্তিব নিম্নলিখিত বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন—



মহাভাবে কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা, উভয় প্রকাব ভক্তিব পূর্বোল্লিখিত উনবিংশ প্রকাব অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুব এখানে উহাই নির্দেশ কবিযাছেন।

হইত! আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রী শরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে ঐরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় বেদান্তের পূর্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্বপূর্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর

মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'

হইয়াছে।" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্তন-সকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরিক জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও
১ ঘনীভূত হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শনলাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, মধুরভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি—ঐকালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখন আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি, তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে কৃষ্ণমূর্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এইরকম রং ছিল।"

ঠাকুরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে

একপ্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়েঘরের পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমি থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকশবজি উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন, এবং একখানি সুতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐসকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে তাঁহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটি দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবতগ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিন এক, এক তিন,' রূপ দর্শন

ঠাকুর বলিতেন—ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনপ্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান—তিন এক, এক তিন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঠাকুবেব বেদান্তসাধন

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইযা ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, তাঁহার এইকালের মানসিক অবস্থাব কথা একবার আলোচনা করা ভাল।

ঠাকুরের এইকালের মানসিক অবস্থার আলোচনা (১) কাম-কাঞ্চনত্যাগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা

আমরা দেখিযাছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে সাধকের সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, 'যাঁহা রাম তাঁহা কাম* নেহি' †—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষযে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি

---

* সকাম কর্ম

† যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুঁহু একসাথ, মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
—তুলসীদাস-কৃত দোঁহা

স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিষয়কামনা ত্যাগপূর্বক নয় বৎসর নিরন্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায় অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়েব স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিযা প্রতীত হইত। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসাব পরাৎপর বস্তু বলিযা সর্বতোভাবে ধারণা কবায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

(২) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক ও ইহামূত্রফলভোগে বিরাগ

রূপরসাদি বাহ্যবিষযসকল এবং শবীরের সুখদুঃখাদি বিস্মৃত হইযা অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, সামান্য আযাসেই উহা সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া লক্ষ্য বিষয়ে তন্ময হইযা আনন্দানুভব কবিত। দিন মাস ও বৎসর একে একে অতিক্রান্ত হইলেও উহার ঐ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

(৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব

পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার এখন সীমা ছিল না। উহাদিগের সহায়ে তিনি যে এখন আপনাকে তাঁহার সহিত সুপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিত্যযুক্ত দেখিতেন তাহা

নহে, কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাধক যে তাঁহাকে সর্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা

প্রশ্ন উঠিতে পারে—জগৎকারণকে ঐরূপে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সর্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবাব সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাঁহাকে লাভ করিবাব জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি পবম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঐ কথার উত্তর আমরা পূর্বে একভাবে করিয়া আসিলেও তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই-চারিটি কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রেব তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে

ঈশ্বর দর্শনেব পবেও ঠাকুর কেন সাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষযে তাহার কথা

ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।

পূর্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্বভাবাতীত বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতাব নির্গুণ নিবাকার নির্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি কবিযাছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারেব মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিযা ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইযাছে বলিযা লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবাব যখন উপস্থিত হইল, তখন

ঠাকুরের জননীর গঙ্গাতীরে বাস করিবার সংকল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—পুত্রের আরোগ্যকামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্রের দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও তিনি উহার অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইযা দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ়সংকল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্ম এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিযা চলিল, তবে বৃদ্ধ বযসে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইযাছিলেন এবং এখন হইতে দ্বাদশবৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগেব কালের মধ্যে তিনি কামারপুকুরে পুনর্বার আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বর-অবস্থানকালে হইযাছিল, তদ্বিষযে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের জননীর লোভরাহিত্য

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচাযক একটি ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, ঐকালে কালীবাটীতে মথুরবাবুর অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরেব প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায় তিনি ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ম ভিতরে

ভিতরে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে এপর্যন্ত সাহসী হন নাই। তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐকথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইযা 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগলাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন— "ঠাকুরমা, তুমি তো আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও।" সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না। সুতরাং কি চাহিয়া লইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল—"বাবা, তোমার কল্যাণে আমার তো এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব তখন চাহিয়া লইব।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁটরা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন—"দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে। আর তোমার কল্যাণে

এখানে খাবার তো কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই তো তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি, বল?" মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'যদি নেহাত দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া দাও।" বিষয়ী মথুরের ঐকথায় চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার সামান্ত ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐকথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন—সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে তিনি এক সময়ে বিষণ্ণ হইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক' বলিয়া প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ দর্শন ঠাকুরের বেদান্ত-সাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাবসাধনের সময়

তাঁহাকে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক রমণীর ন্যায় থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর একদিন জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণসহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন-লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈত-ভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

ভক্তের স্বভাব—তাঁহার সাযুজ্য বা নির্বাণ মুক্তিলাভে কখন প্রয়াসী হন না। শান্তদাস্যাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরের প্রেমের মহিমা ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতেই তাঁহারা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের 'চিনি হওয়া ভাল নয়, মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্বকালপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থালাভের জন্য প্রয়াস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছিলেন

এবং তিনি তাঁহাকে যেভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেইভাবেই তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও ঐ কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণপূর্বক নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সর্বপ্রকার সাধনের অন্তে ঠাকুর জগদম্বার ঐ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিযাছিলেন এবং উহা বুঝিযা জীবনের অবশিষ্ট কাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইযা লোককল্যাণসাধনরূপ তাঁহার সুমহৎ দায়িত্ব আপনার বলিযা অনুভবপূর্বক সানন্দে বহন করিযাছিলেন।

মধুরভাবসাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনের যুক্তিযুক্ততা আর একদিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে সর্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিযাছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠা-লাভে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টায় যুক্তিযুক্ততা

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক বুঝিতে পারিব—

সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাসপূর্বক সাধনভজনে নিমগ্ন

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন

থাকিয়া তিনি ইতিপূর্বে নির্বিকল্পসমাধিপথে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণায় তিনি পূর্বভারতে আগমনপূর্বক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে বাহ্যজগতের উপলব্ধি হইলেও উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। মায়াকল্পিত জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, দেশ, কাল ও পদার্থে উচ্চাবচ ব্রহ্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ঐকালে দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ তোতার তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়দর্শনান্তে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। ঐজন্য কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, একথা তাঁহার তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন-বিষয়ে প্রত্যাদেশলাভ

কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনে একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন—বেদান্তসাধনের এরূপ

উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে ?"

জটাজূটধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন, "কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐকথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরলভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার আচরণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে করুণা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা অনুমান করিতে পারি। কারণ শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা

ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া?—গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের জন্য সাধকের পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ও সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন না এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন—বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—গোপনে করিলে যদি হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'উত্তম কথা, শুভ মুহূর্ত

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ

উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব' বলিয়া পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। কারণ সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব কার্যসকল সম্পাদন

ঠাকুর যখন যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি-অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তের উদয় হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্বোচ্চার্য মন্ত্রসকলের পূত-গম্ভীর

ধ্বনিতে পঞ্চবটী-উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহসম্পূর্ণ কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির সুখস্পর্শ যেন নূতন জীবনের সঞ্চার আনয়ন করিল এবং যুগযুগান্তরের অলৌকিক সাধক বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতার্থ সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন—ঐ সংবাদ জানাইতেই ভাগীরথী যেন আনন্দকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ-পূর্বক সেইসকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল—

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনামন্ত্র

"পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্! দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষকরুণাযোগ্য বালক সেবক। হে সংসার-দুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর! দ্বৈত-প্রতিভারূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্! আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া তদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব! জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয়, তাহাই কর। সূর্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নির্দেশে অনুকূলপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভে সহায়তা করুক। হে ব্রহ্মন্! তুমিই জগতে বিশেষশক্তিমান

চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। শরীর-মন-শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-ধারণের যোগ্যতালাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতিপ্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও।"*

অনন্তর বিরজাহোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চক শুদ্ধ হউক, আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব-সম্পাদ্য বিরজাহোমের সংক্ষেপ সারার্থ

'প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক, আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক আমার কোষ-পঞ্চক শুদ্ধ হউক, আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-প্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্মাদি শুদ্ধ হউক, আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান! জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ

* ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের ভাবার্থ।

পুরুষ, জাগরিত হও। হে অভীষ্টপূরণকারিন্! তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে, সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয়, তাহা করিয়া দাও; আহুতি দ্বারা রজোগুণ-প্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতিপ্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোকলাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্বভূতকে অভয়প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোমপরিসমাপ্তি হইল। অনন্তর শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমানকাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে* ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ-গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি-সহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর, দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র, যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরমানন্দ নাই, কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইযা রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দীক্ষাপ্রদান করিয়া

ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবা-মাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি তিন দিন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্প সমাধিসম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি। হইবে না, এত বড় কথা। বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচের ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।' তখন পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।"

ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলাভ

ঠাকুর পূর্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে, এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি যথার্থ লাভ করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গলমোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন, ঠাকুর সেইভাবেই বসিয়া আছেন—দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিপূর্ণ। বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে।

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি, তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি-না, নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি-না

বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারংবার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার, বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না। তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল—নির্বিকল্প সমাধি! তিন দিনে* হইয়াছে! দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া!

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্'-মন্ত্রের সুগভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র† সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ (৯ম সং), ৫১ ও ১০৪ পৃঃ, 'কথামৃত' ৪র্থ ভাগ (৮ম সং) ৩১০ পৃঃ।—প্রঃ

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়।

ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোক-কল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা জানিতে পারিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুরবাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটি ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচলভাব ধারণপূর্বক চিরকাল তাঁহাকে ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-বৈদ্যসকল তাঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুক্ত মথুরের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্যপরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন, তাহা আমরা পাঠককে জানাইয়াছি।

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর বিষয়ের উপর পূর্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিযাছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার-বৈদ্যবা জবাব দিযা গেলেন, মথুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐপ্রকার উন্মত্তপ্রায অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদগদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারংবাব বলিতে লাগিলেন, "আমার যাহা হইবার তাহা তো হইতে চলিল, বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।"

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্যলাভ করিবে।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেইদিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল, তাহা কি অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সেইজন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়া হউক অথবা অদ্বৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয়মাস কাল পর্যন্ত যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক, তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জিত মন এখন যে অপূর্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক হইয়া দূরে নির্বিকল্পভূমিতে এককালে উপনীত হইত এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত। সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে উহার

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি—ঐকালে তাঁহার মনের অপূর্ব আচরণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

সামান্তমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এইকালে তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গবিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংস সকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।* ঐসকল উচ্চতত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতরসাধারণের স্থায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের ফলে তাঁহার উপলব্ধিসমূহ

আমরা অন্যত্র বলিযাছি, নির্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানকালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন।† 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা, উহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ পূর্ব দুইবারের স্থায় ঠাকুর এইকালে কোন দৃষ্ট মূর্তির মুখে ঐকথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয় অদ্বৈততত্ত্বে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান না কবিয়া যখনই তাঁহার মন ঐ তত্ত্ব

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়। † এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ

হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হইয়া আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তখন উহা ঐ বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।* ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার মনে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ শরীররক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় বারংবার ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি এখন ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিস্মরত্বসহায়ে ঠাকুর এইকালেই সম্যক বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান আধিকারিক অবতারপুরুষ, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া লোক-কল্যাণসাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদি করিতে হইয়াছে। একথাও তাঁহার এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্য-বিশেষ-সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহৈশ্বর্যেব আড়ম্বরপরিশূন্য ও নিরক্ষর করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আনয়ন করিযাছেন এবং ঐ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকে বুঝিতে সমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তাঁহার শরীরমনের দ্বারা জগতে উদিত হইবে, তাহা সর্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরেব কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ কবিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাবসহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্বে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়

সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।* অথবা ঐ ভাবের পরিপাকে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতিপূর্বে তিনি যেভাবে যথায় যতবার শরীর পরিগ্রহপূর্বক যাহা কিছু সুকৃত-দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরত্ব ও রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারংবার একইভাবে জন্ম-পরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্যসহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্বে সাধকের জাতিস্মরত্বলাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

উপনিষদ্ বলেন†, ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব, পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐসকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষের সর্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্যের স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্যলাভ—উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্যসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐসকল শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন না। পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভের

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্বপ্রকার যোগ বিভূতি ও সিদ্ধ-সঙ্কল্পত্ব-লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানং। —পাতঞ্জলসূত্র বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র

† ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮ম প্রপাঠক, ২য় খণ্ড

পরে তদবস্থাতে কালাতিপাত করে। কারণ চিত্ত সর্বপ্রকারে বাসনাশূন্য হওয়ায় সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা সে কিছুমাত্র অনুভব করে না। আধিকারিক পুরুষেরাই* কেবল সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত শাস্ত্রকথা অনুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব উপলব্ধি-সকলের কারণ বুঝা যায়

পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এইকালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বপ্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই, অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায়, জাতিস্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ'-রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক 'শ্রীরামকৃষ্ণ'রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায়, লোককল্যাণসাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা তাঁহাকে নিজ শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐসকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন

* লোককল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এবং কেনই বা তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব আধিপত্য লাভ করিতেছে।

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ

কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাব-ভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐসকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐকালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐসকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল তাঁহার মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়—অদ্বৈতভাবে অবস্থান-পূর্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং যতদিন না তাঁহার মন পুনরায় বহির্মুখী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ঐসকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। ঐরূপে সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব'—তাহা এইকালে পূর্ণ হইয়াছিল।

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি

অদ্বৈতভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া,

তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষকথা এবং যত মত তত পথ।"

পূর্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ পূর্ণ-ভাবে করে নাই

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা-প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা ও সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি এবং পূর্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, একথা প্রথমে তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলামধর্মসাধন

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার-ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা এইকালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে ধর্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলামধর্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ করেন। ধর্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামধর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে কোরানপাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

সুফী গোবিন্দ রায়ের আগমন

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল স্থান বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসন বিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের অন্যত্র ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিনযাপন করিতেন।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।'

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা'মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিযাছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ

হৃদয় বলিত, মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যসকল, এমন কি গো-মাংস পর্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

মথুরামোহনের সাহুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন।

মুসলমান ধর্মসাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।" ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলামমতসাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়

নির্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈত ভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত।

সঙ্কল্প না করিলেও সামান্যমাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব, এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে ঐ ভূমিতে আরোহণে সমর্থ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দূরপ্রসারী ছিল।

পরবর্তী কালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্মৃতি কতদূর প্রবল ছিল

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালীদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনামূল্যে ঘাস লইবার অনুমতি-লাভে সানন্দে সারাদিন ঐ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাহ্ণে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান। 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'— বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

ঐ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া

একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটি লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালক ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন।

(২) আহত পতঙ্গ

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয় দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয়, ঐকালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

(৩) পদদলিত নবীন দূর্বাদল

কালীবাটীর চাঁদনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গা দর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের

(৪) নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব

কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারংবার বলিতে লাগিল, "মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।" পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর। ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* গুরুভাব, পূর্বার্ধ—২য় অধ্যায

সপ্তদশ অধ্যায়

জন্মভূমিসন্দর্শন

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া মথুরবাবু প্রমুখ সকলে স্থির করিলেন, তাঁহার কয়েক মাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। মথুরপত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরের কামারপুকুরের সংসার শিবের সংসারের ন্যায় চির-দরিদ্র বলিয়া জানিতেন অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'কে যাহাতে কোন দ্রব্যের অভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই প্রকারে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় গুছাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।* অনন্তর শুভমুহূর্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

ছয় বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল, একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া—সেই সকলই তাঁহাতে পূর্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একটা অদৃষ্টপূর্ব অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহাদিগের অন্তরে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণ যেভাবে দেখিয়াছিল

তদ্ভিন্ন অন্য এক বিষয় তাঁহারা এখন বিশেষরূপে এই ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে একটি ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দূরে যাইলে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েন। সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া

সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা; সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুব ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমনপূর্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন-চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয়-সাত মাস হইল চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে বিবাহের পরে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীশ্রীমার কামার-পুকুরে আগমন

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়-সাত মাস ছিলেন। তাঁহার বাল্য-বন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্বের স্থায় মিলিত হইযা তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুবও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইযাছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পব অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালক-বালিকা-দিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীডাদিতে যোগদান করিযা যেরূপ আনন্দ অনুভব কবেন, কামারপুকুরেব স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিযা ঠাকুরেব বর্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইযাছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিযা যাহাতে তাহাবা সংসাবে থাকিযাও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষযে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে, তদ্বিষযে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, একথা নিশ্চয বলা যায়। ক্রীডা, কৌতুক, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিযা তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐসকল বিষয যেভাবে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইতে আমরা পূর্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পাবি।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুগণের সহিত ঠাকুবেব এই কালেব আচরণ

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিযা কেহ কেহ ধর্মজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনার তিান বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটি রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় নানা

উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা তাঁহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানাভাবে সন্তরণক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উঁহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে।" রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রমণী সত্যই বলিয়াছে। আশ্চর্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল।"

কামারপুকুর-বাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব নূতন ভাবে দেখিবার কারণ

কামারপুকুরপল্লীস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয়, ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ ঐ কেবল সাড়ে ছয় বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐকালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি

আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে—দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতরে পুনরায় ফিরিবার কালে সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারম্পর্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘ্য-স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐজন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তারাশির অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐকাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়! সুতরাং ঐ কালকে তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চির-প্রেমসম্বন্ধ

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা, তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তি-পরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইহারা সকলে প্রায় সর্বক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা

গৃহকর্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রমণীগণ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিজ সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসিগণের ঐসকল মধুর আচবণ এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সেসকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি,* সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনের আরম্ভ

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্যপালনে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিজ পত্নীর তাঁহার নিকটে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানপূর্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।" শ্রীমৎ তোতার পূর্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য উপেক্ষা বা অর্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না, বর্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক, পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসব হইয়া তিনি ঐ বিষয়ে অর্ধনিষ্পন্ন কবিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা এবং গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার কারতে পারেন এবং সর্বোপবি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন,* তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য-সম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আমরা অন্যত্র আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে আজীবন পূজা করিতে বং তাঁহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গডিয়া তুলিতে সমর্থা লেন।

ঐ বিষয়ে ঠাকুব কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন

তি কর্তব্যপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন য় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায়

ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।* তাঁহার মনে হইয়াছিল, সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ঐরূপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঐরূপেই এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ঐ ঘটনায় তাঁহার অভিমান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করিয়াছিল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রকাশ্য পরিচয় পর্যন্ত প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, "সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান তো আমিই করিয়াছি!" অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণদর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী শ্বশ্রূতুল্যা জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্বদা ব্রাহ্মণীর সেবাদিতে নিযুক্তা থাকিতেন এবং তাঁহার কোন কথা বা কার্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিয়াই মানব উহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে পারে এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণসাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। অহঙ্কারের বশবর্তিনী হইয়া তিনি 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' ব্যবহার করিতে না পারিযা এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

অভিমান-অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিনাশ

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্মপরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাসভক্তি-দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "আমরাই

ঐ বিষয়ক ঘটনা

উহা করিব এখন।" ব্রাহ্মণী বারংবার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐকথা শুনিতে পাইল। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্যে বিরত হইতে বলিলেও তিনি তাহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।" ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, বলিলেন—"না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে* মনসা† শোবে এখন!" তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদশান্তি করিলেন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী সেদিন নিরস্তা হইলেও অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া

* অর্থাৎ দেবমন্দিরে।

† ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন ঐরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে, তখন অতঃপর এইখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। সদসদ্বিচারসম্পন্ন বিবেকী সাধক যখন অন্তরদর্শনে নিযুক্ত হয়েন, চিত্তের কোন মলিন ভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েক দিন গত হইলে এক দিবস তিনি ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচর্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন! পরে সংযতা হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশীগমন

ঐরূপে প্রায় সাতমাসকাল নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন

অষ্টাদশ অধ্যায়

তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা

মথুরবাবু এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্থসকল দর্শনে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং গুরুপুত্রাদি অন্যান্য অনেক ব্যক্তি সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে বৃদ্ধা জননী* এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া

অনন্তর শুভদিন আগত দেখিয়া মথুরবাবু ঠাকুরপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখ হইবে। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।† সেজন্য হৃদয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার সময়-নিরূপণ

হৃদয় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু এইকালে

---

* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিল।

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve) করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং বন্দোবস্ত ছিল কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ী ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়া মথুরবাবু কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন।

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত

দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জন্য মথুরবাবু কয়েকদিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রী-পুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।*

৺বৈদ্যনাথদর্শন ও দরিদ্রসেবা

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকটে কোন স্থানে কার্যান্তরে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্তী গাড়ীতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্যের তত্ত্বাবধানে

পথে বিঘ্ন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

একখানি স্বতন্ত্র (special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্রবাবু কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

কাশীধামে পৌছিয়া মথুরবাবু কেদার ঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন।* ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল।

কেদার ঘাটে অবস্থান ও ৺বিশ্বনাথদর্শন

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পানসিতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ ৺বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের তো কথাই নাই। ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দর্শন করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামীজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণপূর্বক ঠাকুরকে

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়বসকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ইহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।" স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামীজীকে দেখিতে গিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।*

পাঁচ সাত দিন কাশীতে থাকিযা ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিযাছিলেন। মথুরপ্রমুখ

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ

সকলে তথায় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "আমার করিবাব আবশ্যক নাই।" প্রযাগ হইতে মথুরবাবু পুনরায় ৺কাশীতে ফিবিয়াছিলেন এবং এক পক্ষকাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থানদর্শন

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনেব নিকটে একটি বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন ভিন্ন ঠাকুব এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১৩১ পৃঃ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, ১৪৫ পৃঃ।—প্রঃ

নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ইহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।"

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি

এক পক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে সুবর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন—ব্রাহ্মণীর শেষ কথা

কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল এবং চৌষট্টিযোগিনী নামক পল্লীস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটি রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি-বিশ্বাসদর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

বীনকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীনকার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীনকারের ভবনে হৃদয়ের

সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশবাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে 'মা, আমায় হুঁশ দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব'—এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল। ঐরূপ প্রার্থনার পরে তিনি বাহ্যভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সদানন্দে বীণা শ্রবণপূর্বক মধ্যে মধ্যে উহার সুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশবাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশবাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি* থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত,

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন ও আচরণ

ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৭ম অধ্যায়

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবু দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐকালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান কবিয়াছিলেন।

হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসাবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ-সুখে কালযাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত, ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও, সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্যকুশলতা

বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে মাতুলের অলৌকিকত্ব শ্রবণে এবং তাঁহাতে দৈবশক্তিসকলের প্রকাশদর্শনে তাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবাদ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার একপ্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনই তাহার মন ঐসকল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে, মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনই ঐসকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল-সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিবার পরে সে পারত্রিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পত্নী-বিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যক নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে।—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

ঐরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিসকলের দর্শন এবং অর্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল।

হৃদয়ের ভাবাবেশ

মথুরবাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"হৃদুর আবার একি অবস্থা হইল, বাবা?" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না—একটু-আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল, তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।" মথুর বলিলেন, "বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐসব অবস্থা কেন?"

মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ময়-পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিতেছে! চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন

পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও

ঠাকুরকে পুনঃপুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, 'আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি?' ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে। মনে হইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন-অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, এবং তাঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি। ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং অর্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল —"ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা, আমিও তাহাই!"

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্ থাম্, অমন বলিতেছিস্ কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে!' কিন্তু সে কি তাহা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে'।"

হৃদয়ের মনের জড়ত্বপ্রাপ্তি

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্বে যেমন ছিল, আবার তেমনি হইল। অপূর্ব আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, "মামা,

তুমি কেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে বলিলে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হইবে না?" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিয়াছি? তুই এখন স্থির হইয়া থাক্ —এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই তো আমাকে ঐরূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া থাক্, সময় হইলে আবার কত কি দেখিবি!"

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন

ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্বে জপ-ধ্যান করিতেন, সেই স্থলে ৺জগদম্বাকে ডাকিবে, এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগপূর্বক পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চীৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, "মামা গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম!" ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কি হইয়াছে?" হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা হইতেছে!"

ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি? তোকে বলিয়াছি আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।" হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনই শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্ম্মসকল তাহার পূর্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিতে মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মথুরবাবুর জমিদারিতে খাজানা আদায়ের কর্ম্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছে। সময় ফিরায় বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্মী হৃদয়ের ঐ কার্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুরবাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে, কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুন্নমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুন্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস্। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।" ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমীবিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব

করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই তিন বৎসর পূজা করিবি।"—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল।

দুর্গোৎসবের শেষ কথা

ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্নপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরে পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

উনবিংশ অধ্যায়

স্বজনবিয়োগ

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর হইবে। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা

জন্মগ্রহণকালে অক্ষয়ের প্রসূতির মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্বে দুই তিন বৎসরকাল পর্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে ও সর্বদা আদরযত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; এ ছেলে বাঁচিবে না!" পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রমপূর্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি,

অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিল। তাঁহারা বলিতে, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল—দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের রূপ

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় সে প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্যে ব্রতী হইল, তখন আপনার মনের মত কার্যেই নিযুক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, ঐ সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁশ হইত!" হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক অনেকক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিত, পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন-সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে নিবিষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় সে এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিত যে, তজ্জন্য তাহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ সালের অর্ধেকের অধিক অতীত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্র মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমনকালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

অক্ষয়ের বিবাহ

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তার-বৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন

হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন, "হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষসগণবিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাইবে দেখিতেছি!" যাহা হউক, তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না।"

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া—অক্ষয়ের মৃত্যুঘটনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা

হৃদয় বলিত, "তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়া ওরকম কথাগুলা কেন বাহির হইল ?'—তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছি ? মা যেমন জানান ও বলান, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে ?"

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল এবং সুচিকিৎসকসকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া-আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অক্ষয়, বল্, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!" অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন।

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন ক য়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও প্রাণে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট

বোধ করিয়াছিলেন।* অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মথুরবাবুর বৈঠকখানা বাটীতে অতঃপর আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদগ্রহণ

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের সবপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্যের ভারার্পণপূর্বক মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক এক ব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম সম্পন্ন করিত।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্রনারায়ণগণে সেবা

অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রে অনভিজ্ঞ বালক-বোধে সর্বতোভাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দশা ও

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়

অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন মথুরের জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্তী ছিল না।

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃহ-দর্শন

বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্‌রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।* মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে

---

* হৃদয় বলিত, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটীতে তখন হরিসভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমনপূর্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি।* উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় মথুরবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কালনায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবানদাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সেসকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।† সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐ সকল পুণ্যস্থানদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গার চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। মথুরবাবু প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কালনা, নবদ্বীপাদি দর্শন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিয়াছিল। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

মথুরের নিষ্কাম ভক্তি

এক সময়ে মথুরবাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাইয়া কি করিব, তাহার ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।"

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহা তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?"

মথুর তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।"

ঐ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে

তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকালপরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐ ভাব ভুলিয়া তখনই আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূবক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে, আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব।' মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন—সুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার অবর্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমাব পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব!' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী

বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ও দ্বারকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।* উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

অন্য এক দিবস মথুরবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'কই বাবা, তুমি যে-বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই তো এখনও আসিল না?' ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন। অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে সকলি তো একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন সত্য হইল না কে জানে।' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক আর নাই আসুক, বাবা, আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি—তবে আর তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে? আমি একাই একশত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন অনেক ভক্ত আসিবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বলচ তাই বা হবে।' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

* "Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving". Quoted from Plaintiff's statement in High Court, Suit No. 203 of 1889.

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরির্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন, মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তদনুষ্ঠিত শুভ কর্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতার-পুরুষের সেবকেরা যে বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

মথুরের ঐরূপ নিষ্কামভক্তি লাভ করা আশ্চয নহে—ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আঁষাঢ়েরও অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি হইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাঁহার ভক্তকে নিজ স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষদিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না, কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন।

মথুরের দেহত্যাগ

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন (তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে) এবং বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্য রথে উঠাইয়া লইলেন—তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।" পরে গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্ম্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় দেহরক্ষা করিয়াছেন।* ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও ভোগ-বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায় পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে একথা আমরা অন্য সময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনাদর্শন

* "Mathura Mohun Biswas died in July, 1871, intestate, leaving his surviving Jagadamba, sole widow. Bhupal since deceased, a son by his another wife who had predeceased him—and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba".

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Charan Biswas vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

৺ষোড়শী-পূজা

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবনপ্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঐকালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকামাত্র ছিলেন

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐকালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয়

না এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণী সকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কালযাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রামমধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীর-মনের পরিণতি হয়

চতুর্দশ বৎসরে (বস্তুতঃ) প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী নিতান্ত বালিকাস্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্য-জীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্নলাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন— এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর তখন একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে

ঐ ভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রাম-বাটীতে বাসের কথা

পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সংবরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন,—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজসকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা-প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত

করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়' ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—'তবে কি পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নিবন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তো আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তা থাকাই উচিত।' অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিবেন, পরে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐকালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায়* শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর ঐজন্য আগমন করিবেন

* ১২৭৮ সালের দোলপূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র পড়িয়াছিল (ইং ২৫শে মার্চ, ১৮৭২)।—প্রঃ

বলিয়া ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত

রেল কোম্পানির প্রসাদে সুদূর কাশী, বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটী উহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, অতএব তখনকার তো কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমিদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূরপথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা সকলে প্রথম দুই-তিন দিন সানন্দে

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর

পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌঁছান পর্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্ভুত দর্শনবিবরণ

পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখন কখন নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছেন—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।' শুনি। অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললে,

'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

রাত্রে জ্বরগায়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান ও ঠাকুরের আচরণ

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রে পূর্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব দিবসের ন্যায় প্রবলবেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?" ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবতঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় বিশ্বাস-সূর্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবুদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন। অতএব কর্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন—এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐস্থানে অবস্থানপূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনাপূর্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধনলব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্যপরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে নিকটে পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষা-প্রদান

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি

ইতিপূর্বেই তো ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন ? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত, সন্দেহ নাই ; ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণসাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্বথা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল, তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি ; তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে,

ইতিপূর্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ

যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরানীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সবপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুরানীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক তো তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি যে এখন পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজ গৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরানীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ

পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটি কথা, যাহা ইতিপূর্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন

শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসংবাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!"

ঠাকুরের নিজ মনের সংযম পরীক্ষা

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।" ঐরূপ বিচার-পূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতারপুরুষ করেন নাই—উহার ফল

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস* অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না। —একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদের মন, প্রিয়

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

---

* 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে, "দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন।" শ্রীশশিভূষণ ঘোষ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ৩ মাসের মধ্যেই" ষোড়শীপূজার উল্লেখ আছে। অধিকন্তু 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ২য় ভাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠায় ৮ মাস একত্রে শয়নের উল্লেখ আছে। 'গুরুভাব—পূর্বার্ধ', ১৫২ পৃষ্ঠায় ও ৮ মাস শয়নের কথাই সমর্থিত হয়।—প্রঃ

বোধ করিয়া দেহের রমণকামনা করিল না। ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে'—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহ-বুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে কখন ৺জগদম্বার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি এখন উহা কার্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর

নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে।* আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে ৺দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য অস্তগমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালে সেবা-পূজা-সমাপনানন্তর দীনু পূজারী আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে পূজাকালে পস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

৺ষোড়শীপূজার আয়োজন

পূজাদ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত

* শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —প্রঃ

করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ইতিপূর্বে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন, তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজা-করণ

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান-তিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপ-পূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা

প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল—মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী প্রায় পাঁচমাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগ নহবতঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে, মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত। কখন ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে, এ আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি একরাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল।

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে

মাতাঠাকুরানীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে প্রায় এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া ১২৮০ সালের আরম্ভে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।*

* শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ

একবিংশ অধ্যায়

সাধকভাবের শেষ কথা

৺ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূর্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন, মান, নাম, যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বহুপূর্বেই তিনি উহাতে বিসর্জন করিয়াছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন!—ছিল কেবল বিবিধ সাধনপথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন! অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

৺ষোড়শী-পূজার পরে ঠাকুরের সাধন-বাসনার নিবৃত্তি

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—পরে, নানা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব

তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকার রূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে—সুতরাং তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

কারণ, সর্বধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন

এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণপার্শ্বে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুলাল ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলে কর্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম

শ্রীশ্রীঈশা-প্রবর্তিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ

করিবার জন্ত অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপালমূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা আমাকে এ কি করিতেছিস্!" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কারতরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কারসমূহকে এককালে তলাইয়া দিল। তখন দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্বক খ্রীষ্টীয় পাদরিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্তির সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতে অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে

বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি!' তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল! ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি, তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ রে, তোরা তো বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে? তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?" আমরা বলিলাম, "মহাশয়, ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি নাই; তবে ঈশা য়াহুদী জাতিতে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়!" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!" ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? য়াহুদিজাতীয় পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্মমত-সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদ-বুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া-রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা

জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টিসহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্নগ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আট্‌কে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।" আমাদিগের ধারণা, ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

ঠাকুরের জৈন ও শিখধর্মমতে ভক্তিবিশ্বাস

জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্মপ্রবর্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পর জীবনে জৈন এবং শিখধর্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐসকল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য দেবদেবীর আলেখ্যের সহিত

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—৩য় অধ্যায়

তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐসকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ-সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সে যাহা হউক, সবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়-সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানববুদ্ধিতে উহাদিগের সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব।

সর্বধর্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধি সকলের আবৃত্তি

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধন-ভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া তিনি তদুভয়ের বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ সাধক একটিমাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যতদিন পর্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছেন, ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ হইয়াছে এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যে নূতন আলোক আনয়নপূর্বক জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য নহে।

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার

দ্বিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি হইবে না। সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ যিনি ঈশ্বর হইতে সর্বদা অভিন্ন—তাঁহার অংশবিশেষ, তিনি তো সর্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নতাই নাই; অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণসাধন-রূপ কর্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে

(২) তাঁহার মুক্তি নাই

হইবে? ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সরকারী কর্মচারীকে জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।" যোগদৃষ্টি-সহায়ে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ* বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময়নিরূপণ পর্যন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "দুই শত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে, তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে!

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "শেষকালে আর কিছু খাইব না, কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি।†

---

* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব—

প্রথম—সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

(৪) সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ

যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ম-বিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতার ইতিপূর্বে সাধনসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইযা অবতারসকলের স্থাননির্দেশ কবিতে হইলে, ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব

(৫) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে

ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতিও অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে, তাহা স্বল্প-চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক

সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার ঐ মীমাংসা সর্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার-লাভের একমাত্র পথ। ঐ বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

"মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।"

কর্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দেশ করিয়া বলিতেন- 'সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্বপ্রকার গৃহকর্মত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান।

(৬) কর্মযোগ-অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে

অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু

কার্য বড়লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।

(৭) উদার মতে সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে

তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাব নিকট ধর্মলাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি—কালে এই মূর্তির* ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'যাহাদের শেষ জন্ম, তাহারা তাঁহার নিকটে (ধর্মলাভ করিতে) আসিবে।' ঐ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা

* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূর্তি।

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনকালে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন

পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি। বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরেব সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে যেসকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই, এরূপ উচ্চাবস্থা-সকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—তোমার অবস্থা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!" ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা এব পূর্বোক্ত অপূর্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুরবাবু জীবিত থাকিবার

কালে গৌরী পণ্ডিত যে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন, একথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয়, শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐ জ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন, ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন মথুরবাবুর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যেভাবে সংসারত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি।

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিরূপণ

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দানগ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

সাধকভাবের শেষ কথা

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিত হৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরবতীর্ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয়, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব-সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা, প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় হইয়া পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত, তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের

আগমনের কথায় উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত, তখন ধৈর্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহাব বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।"

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থের সহিত ঐ সকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

৺ষোড়শী-পূজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমনকালের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সন ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌঁছিবার স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য জ্বরাতিসাররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিযাছি, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

রামেশ্বরের মৃত্যু

রামেশ্বর বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকিরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকির আসিয়া বলিত রন্ধনের জন্য আমার একটি বোক্‌নোর অভাব, কেহ বলিত আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐ সকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, ঐরূপ দ্রব্য আবার কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগেব কেহ কেহ* শ্রবণ কবিযাছেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা

রামেশ্বব বাটীতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুব ঐ কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন—"সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।" ঐ ঘটনার পাঁচসাত দিন পবেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোক গমন কবিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীব প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং মন্দিরে গমনপূর্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা-সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা ঐ কথা শুনিয়া অল্প-স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন

রামেশ্বরের মৃত্যু সংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে ভাবিযা ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল

* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী

মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া স্বর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোকদুঃখ ঐজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রামেশ্বর পাঁচ-সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটি আমগাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ভাল হইল, আমার কার্যে লাগিবে।" মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোকে ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবেন তাঁহাদের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। গোপাল বলিতেন, তাঁহার মৃত্যু যে দিন যে সময়ে হইয়াছিল, সেই দিন সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন,

'আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!' গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, 'আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।' গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্য সত্যই রামেশ্বরের দেহত্যাগ হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭শে তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থি সঞ্চয়পূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থানে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী তথায় যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন, তাহার অর্ধেক ভাগ মাত্র তখন গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ—চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির

পরিশিষ্ট

মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি-পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শম্ভুবাবু ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত ধর্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভুবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর যখন যাহা কিছুর অভাব হইত জানিতে পারিলে শম্ভুবাবু তৎসমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু!" শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ-গুণে শম্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা

* ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভুবাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভুবাবুকে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় রসদদার বলিয়া যখন নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণিবাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভুবাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীব সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভুবাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া সঙ্কীর্ণ নহবত ঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমি ২৫০৲ টাকা প্রদানপূর্বক মৌরুসী কবিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালাঘর বাঁধিয়া দিবাব সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন-উপাধিপ্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপাল-রাজসরকারের শালকাঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহাব পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল না। গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড় গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদি হইতে তিনখানি শালের চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া নির্দেশ করিয়া-

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া, কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য, ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস

ছিলেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উক্ত গৃহে প্রায় বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। গৃহকর্মে সাহায্য করিবে এবং সর্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া একটি রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা ঐই গৃহে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের জন্য নানাবিধ খাদ্য প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখন কখন ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঐরূপে সে রাত্রি তিনি তথায় বাস করিতে বাধ্য হন এবং শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ঝোল-ভাত রাঁধিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন

এক বৎসর ঐ গৃহে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আমাশয়-রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার অল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী

হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীররক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "তাই তো রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!"

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী ও ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পারেন ভাবিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি

৺দেবীর আদেশে উক্ত ঔষধ-সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই!" ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্ররোগে

বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভু শরীররক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!" শম্ভুবাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপূর্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদদাররূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে শম্ভুবাবুর নির্ভীক আচরণ

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রাদেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কিছুকাল পূর্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে একটি অনির্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিতেন এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরানী দিবাভাগে প্রায় সর্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখন শুনিবি না।" জরাজীর্ণ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা—দক্ষিণেশ্বর বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের কর্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধঘণ্টা কাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"এখন কি খাব গো, এখনও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?" কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুশকিল হইত, হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত।

সে যাহা হউক চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহার পূর্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন

আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল। বৃদ্ধা তথাপি ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে! তখন ভীত হইয়া সে ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐ বিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতে অন্তর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিলেন। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের নির্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল

হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম অবস্থা হইলে, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম এককালে উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে; শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলে, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া—তাঁহার গলিত-কর্মাবস্থা

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরিয়া নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্নে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সেদিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং উহার কোঁচার খুঁটটি তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

ঠাকুরের কেশববাবুকে দেখিতে গমন

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে ; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।" শ্রীযুক্ত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।" ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে "কে জানে কালী কেমন—ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন"-রূপ রামপ্রসাদী গীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই ; ভাবিয়াছিলেন উহা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তসহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ খসিয়াছে!" শ্রীযুক্ত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙ্গাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ডাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে; উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!" ঐরূপে নানা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন!

কেশবের সহিত প্রথমালাপ

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুক্ত কেশবের মন তাঁহার প্রতি

এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্য দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটীর' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গলাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, অথবা শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুক্ত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে অনেক বার তিনি ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুক্ত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখন রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল ?" শ্রীযুক্ত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন,

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ

"মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব। আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চাবিটি কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।"

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অভেদভাবে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান-রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহাব ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার কবিয়া লইলেন। অতঃপব ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন—তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।" কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "মহাশয়, পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।" ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ বেশ, এখন ঐ পর্যন্ত থাক।" ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার-রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্মমত দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ঠাকুরের কেশবকে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন বুঝান

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুক্ত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধশ্রবণে মর্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল!"

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ—ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ—ঐ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুক্ত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, "কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্তব্যপালন করিয়াছে।" ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব যে

আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ, দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণচিন্তা করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।* দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই—ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ'রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে

নববিধান ও ঠাকুরের মত

* শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি

হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমতসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষীগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐবিষয়ে সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভারতের ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে, উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐ ধর্মের ঐ জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন, পরে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার

ভারতের জাতীয় সমস্যা ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন

ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য কিভাবে ধর্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ

সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন-মোহকর নগরকীর্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিলন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অদ্ভুত সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান

ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে ; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল।

ঠাকুরের সংকীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন

সে যাহা হউক ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্তনাদি করিয়া ঐ স্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া ঠাকুরের ঐ স্থানে যাইয়া কীর্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাতদিন অবস্থানপূর্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণবসকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত

ঠাকুরের ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব কীর্তনানন্দ-ঐ ঘটনার সময়নিরূপণ

স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কীর্তনকালে তাঁহার অপূর্ব ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্বত্র ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে। রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রামসকলেও ঐ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে, একজন ভগবদ্ভক্ত এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে! তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে সাত দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া সিহড়ে পলাইয়া আসিলে ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়া-

ছিলাম। উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি—

বরানগর-আলমবাজার-নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল পাল কবিরাজ মহাশয় কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট ফুলুই-শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

৺যোগানন্দ স্বামীজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৮ সালে, ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয়মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মথুরবাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা

ঠাকুরের জন্ম সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ব্রাহ্ম-মুহূর্তে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে হইয়াছিল।

সন	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৫৯	১৮৫২—১৮৫৩	কলিকাতায় চতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস)
১২৬০	১৮৫৩—১৮৫৪	চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১	১৮৫৪—১৮৫৫	ঐ ঐ
১২৬২	১৮৫৫—১৮৫৬	১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ঠাকুর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে ও হৃদয় সাহায্যকারীর পদে নিযুক্ত, বিষ্ণু-বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া, ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজকের পদগ্রহণ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগস্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমিদারি কেনা, কেনারাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ; ঠাকুরের ৺কালীপূজকের ও রামকুমারের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ।
১২৬৩	১৮৫৬—১৮৫৭	হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ; রাম-কুমারের মৃত্যু, ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ, ঠাকুরের প্রথমবার

পরিশিষ্ট

		দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন ; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধসেবন।
১২৬৪	১৮৫৭—১৮৫৮	ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য হওয়া ; ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ডদান ; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ।
১২৬৫	১৮৫৮—১৮৫৯	আশ্বিন বা কার্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন ; চণ্ড নামান।
১২৬৬	১৮৫৯—১৮৬০	বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ
১২৬৭	১৮৬০—১৮৬১	ঠাকুরের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী গমন, পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন ; মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন ; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা ও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা ; ১৮৬১, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু , ঠাকুরেব জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া ; ব্রাহ্মণীর গমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধন আরম্ভ।
১২৬৯	১৮৬২—১৮৬৩	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া।
১২৭০	১৮৬৩—১৮৬৪	পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা ; মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠান ; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন ;

		জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধন।
১২৭১	১৮৬৪—১৮৬৫	তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণ।
১২৭২	১৮৬৫—১৮৬৬	হলধারীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদগ্রহণ, শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩	১৮৬৬—১৮৬৭	ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমান-ধর্মসাধন।
১২৭৪	১৮৬৭—১৮৬৮	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন; অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘ মাসে তীর্থযাত্রা।
১২৭৫	১৮৬৮—১৮৬৯	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু এবং দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।
১২৭৬	১৮৬৯—১৮৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।

পরিশিষ্ট

১২৭৭	১৮৭০—১৮৭১	ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন ; কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসনগ্রহণ ; পরে কালনা, নবদ্বীপ ও ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন।
১২৭৮	১৮৭১—১৮৭২	জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে (১লা শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু ; ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।
১২৭৯	১৮৭২—১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।
১২৮০	১৮৭৩—১৮৭৪	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা ; শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর) কামারপুকুরে প্রত্যাগমন ; অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১	১৮৭৪—১৮৭৫	(আন্দাজ ১৮৭৫ এপ্রিল) শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা ; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া ; ... ানকে ৺অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ; ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।
১২৮২	১৮৭৫—১৮৭৬	(আন্দাজ ১৮৭৫ নবেম্বর) পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন ; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।
১২৮৩	১৮৭৬—১৮৭৭	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

১২৮৪	১৮৭৭—১৮৭৮	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। (আন্দাজ ১৮৭৭ নবেম্বর) শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮৫	১৮৭৮—১৮৭৯	ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন-আরম্ভ।
১২৮৭	১৮৮০—১৮৮১	শ্রীশ্রীমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও হৃদয়ের কটু কথায় পুনরায় ঐ দিবসেই চলিয়া যাওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু।
১২৮৮	১৮৮১—১৮৮২	হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন; শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।